ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

শিক্ষাক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিক্ষাক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী

লেখকবৃন্দ

মোঃ সাইফুল ইসলাম, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

এ কে এম রাফেজ আলম, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

আফজাল হোসেন, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, মাদারীপুর পিটিআই

সম্পাদক

মোঃ সাইফুল ইসলাম, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

সাদিয়া উম্মূল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ ..... ১

শিক্ষাক্রম পরিচিতি ১

শিক্ষাক্রম ১

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ২

শিক্ষাক্রমের উপাদানসমূহ ৩

শিক্ষাক্রমের মূলনীতি ৪

শিক্ষাক্রমের ভিত্তি ৪

শিক্ষাক্রমের ধরন ৬

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল ৮

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়া ১১

সহায়ক তথ্যপঞ্জী ১৩

অধ্যায় ২ ..... ১৪

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ১৪

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ১৪

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ২৬

সহায়ক তথ্যপঞ্জী ৩৪

অধ্যায় ৩ ..... ৩৫

শিখন শেখানো সামগ্রী ৩৫

শিখন সামগ্রী ৩৫

বিভিন্ন প্রকার শিখন সামগ্রী ৩৬

প্রাথমিক ও অন্যান্য স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু শিখন শেখানো সামগ্রী ৩৮

সহায়ক তথ্যপঞ্জী ৪৮

অধ্যায় ৪ ..... ৪৯

শিখন শেখানো উপকরণ ৪৯

শিখন শেখানো উপকরণের ধারণা ৪৯

শিখন শেখানো উপকরণের গুরুত্ব ৪৯

শিখন- শেখানো উপকরণের শ্রেণিবিভাগ ৫০

শিখন শেখানো উপকরণ তৈরি ৫২

শিখন- শেখানো উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ৫৪

শিখন শেখানো উপকরণ সংরক্ষণ ৫৬
সহায়ক তথ্যপঞ্জী ৫৭
অধ্যায় ৫ ..... ৫৮
শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ৫৮
শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন: গুরুত্ব ও কৌশল ৫৮
শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা ৫৯
শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতাসমূহ ৫৯
সহায়ক তথ্যপঞ্জী ৬০

অধ্যায় ১
শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিক্ষাক্রম হলো একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি ও দিকনির্দেশনা। সফল শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন শিক্ষকের শিক্ষাক্রমের দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। এই অধ্যায়ে শিক্ষাক্রমের মৌলিক ধারণা, এর ভিত্তি ও প্রকারভেদ, সময়ের সাথে সাথে এর চলমান উন্নয়ন ও পরিমার্জন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষাক্রমের মূল দর্শন অনুধাবন করে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়ন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

শিক্ষাক্রম

প্রত্যেক দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে দেশের শিক্ষার চাহিদা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে। প্রতিটি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, আর সে কারণেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করেই দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এক কথায় বলা যায় শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষা কার্যক্রমের মেরুদন্ড। শিক্ষাক্রম শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। শিক্ষানীতি অনুসরণ করে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হয় তার উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তবসম্মত কৌশল হলো শিক্ষাক্রম। অন্যভাবে বলা যায় যে, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের উপাদান ও কাঠামো যা একটি ক্রিয়াশীল সোপানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাই হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমের ধারণার মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। শিক্ষাক্রমের কাজের মধ্যে এর প্রয়োজনীতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সার্বিক বিচারে প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুপরিকল্পলিত শিক্ষাক্রমই মানসম্মত শিক্ষার প্রধানতম উপায়।

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশ। এই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে সমন্বিত করা হয়। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষাক্রমকে শুধু পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যবিষয়ের তালিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং এটিকে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষাক্রমের উপর। শিক্ষকের ভূমিকাও অবশ্য এক্ষেত্রে কম নয়। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ এবং শিক্ষার্থীর আচরণ - সাধারণত এ বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশে ইংরেজি Curriculum শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে শিক্ষাক্রম শব্দটি ব্যবহৃত হয় (এহসান, ১৯৯৭)। ‘শিক্ষাক্রম’ (Curriculum) শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। Curriculum শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Currere শব্দটি প্রাচীন রোমে ব্যবহৃত হতো যার অর্থ Course of study। কারো কারো মতে Curriculum শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ Currer থেকে। এর অর্থ ‘ঘোড়া দৌড়ের পথ’। এর মানে হলো- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সমন্বিত দৌড়ের পথ (রহমান, ২০০৮)।

একজন শিক্ষার্থী কী পড়বে, কে পড়াবে, কোথায় পড়বে, কতদিন পড়বে, কীভাবে পড়বে, শিখন সামগ্রী কীরূপ হবে, কী ধরনের শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশনার সমষ্টিতে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। একটি শিক্ষাস্তর সমাপ্ত করে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণিক স্তর কী হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হয়। এ সব কিছুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অর্থে শিক্ষাক্রম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত শিখন অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং শিক্ষাদান কার্যাবলির সমন্বিত রূপরেখা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আধুনিক শিক্ষাক্রমের ধারণার প্রবক্তা রা’ফ টাইলার

(Ralph Tylor) ১৯৪৯ সালে তার Basic Principles of Curriculum and Instruction[১] বই এ উল্লেখ করেন, শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার্থীর সকল শিখন যা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পনা ও পরিচালিত হয়।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

অতীতে শিক্ষাক্রম (Curriculum) ও পাঠ্যসূচিকে (Syllabus) একই অর্থে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে পাঠ্যসূচিকে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। অন্যদিকে পাঠ্যসূচি হলো শিক্ষাক্রমেরই একটি উপাদান 'বিষয়বস্তু' নিয়ে গঠিত পরিকল্পনা।

পাঠ্যসূচি

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশকল্পে তার শক্তি, বয়স, অভিজ্ঞতা, অভিরুচি প্রভৃতি বিবেচনা করে যখন শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন অংশ কোন শ্রেণিতে কতটুকু শিখতে হবে তা স্থির করা হয়, শিক্ষাক্রমের এরূপ বিস্তৃতভাবে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত অংশকেই পাঠ্যসূচি বলে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরস্পর সম্পর্কিত। শিক্ষাক্রম কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও কর্ম অভিজ্ঞতার সমষ্টি, বিশেষ শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন বিষয় শেখানো হবে ও কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। এর ব্যাখ্যা ও সীমারেখা থাকে পাঠ্যসূচিতে। কোনো নির্দিষ্ট বয়সের বা শ্রেণির শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় বা কর্ম অভিজ্ঞতা কি পরিমাণ শেখাতে হবে তার বিবরণ থাকে পাঠ্যসূচিতে। পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের প্রত্যেকটির বিবরণ প্রদান করে। বস্তুত: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরস্পর এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায় না। নিম্নে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

বিষয়	শিক্ষাক্রম (Curriculum)	পাঠ্যসূচি (Syllabus)
১. পরিধি	এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সামগ্রিক। শিখন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিবেশ ও মূল্যায়ন—সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি ম্যাক্রো-লেভেল (Macro-level) ডকুমেন্ট, যা একটি শিক্ষাব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোর (যেমন: প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তর) ভিত্তি তৈরি করে।	এটি সীমিত এবং কেবল নির্দিষ্ট বিষয় বা কোর্সের পাঠ্যবস্তুর (Topics) তালিকামাত্র। এটি একটি মাইক্রো-লেভেল (Micro-level) ডকুমেন্ট, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন: এক সেমিস্টার বা সাময়িক) জন্য তৈরি হয়।
২. প্রকৃতি	এটি নির্দেশনাধর্মী (Prescriptive)। এটি সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের একটি দর্শন, যা লক্ষ্য অর্জনের পথ নির্দেশ করে। এটি নির্দেশনাধর্মী কারণ এটি শুধু কী পড়ানো হবে তা বলে না, বরং কেন, কীভাবে এবং কোন পরিবেশে তা পড়ানো হবে তার বিস্তৃত নীতিমালা নির্ধারণ করে। এটি শিক্ষককে শিখনফল অর্জনের জন্য আবশ্যক কৌশল ও প্রক্রিয়ার বিষয়েও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি একটি মাস্টার প্ল্যান বা ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে।	এটি বর্ণনাধর্মী (Descriptive)। এতে কেবল শেখার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়। এটি বর্ণনাধর্মী, কারণ এর প্রধান কাজ হলো একটি নির্দিষ্ট কোর্সের বা বিষয়ের কাঠামো এবং বিষয়বস্তুর বিবরণ তুলে ধরা। এটি মূলত তথ্যের একটি তালিকা (list of contents)। এটি শিক্ষককে নির্দেশ দেয় না যে কীভাবে পড়াতে হবে বা কীভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে, বরং কী কী টপিক কভার করতে হবে তার একটি সুস্পষ্ট আউটলাইন দেয়।

[১] https://archive.org/details/basicprincipleso00tyle_0/mode/1up

বিষয়	শিক্ষাক্রম (Curriculum)	পাঠ্যসূচি (Syllabus)
৩. উপাদান	এটি চারটি প্রধান উপাদানে গঠিত: উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন।	এর প্রধান উপাদান হলো শুধু বিষয়বস্তু (Topics)।
৪. প্রণয়নকারী	সাধারণত সরকার, শিক্ষা বোর্ড বা জাতীয় শিক্ষাক্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয়। এর প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নেন।	এটি শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষক দ্বারা একটি কোর্সের জন্য তৈরি হতে পারে। এর প্রণয়ন মূলত একাডেমিক কমিটি বা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে থাকে।
৫. স্থায়িত্ব	এটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী এবং এর পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। একটি শিক্ষাক্রম সাধারণত ৫ থেকে ১০ বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য কার্যকর থাকে।	এটি স্বল্পস্থায়ী এবং প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটি সাধারণত একটি শিক্ষাবর্ষ বা সেমিস্টারের জন্য প্রযোজ্য। প্রয়োজনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় কমিটি দ্রুত কোনো টপিক সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে, যা নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না।
৬. লক্ষ্য	শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ (Holistic Development) নিশ্চিত করা এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা।	একটি নির্দিষ্ট কোর্সের বা বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা।
৭. উদাহরণ	জাতীয় শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক, একটি শিক্ষাস্তরের (যেমন: প্রাথমিক স্তর) জন্য নির্দেশিত সামগ্রিক পরিকল্পনা।	একটি বিষয়ের বা কোর্সের কী কী কোন সময়ে কতটুকু পড়ানো হবে তার বিস্তারিত তালিকা। যেমন: বাংলা প্রথম পত্র কোন মাসে কী কী গদ্য ও পদ্য পড়ানো হবে তার বিস্তারিত তালিকা।

শিক্ষাক্রমের উপাদানসমূহ

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষাক্রমের চারটি মূল উপাদান পাওয়া যায়- উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন (এহসান, ১৯৯৭)। এই উপাদানগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

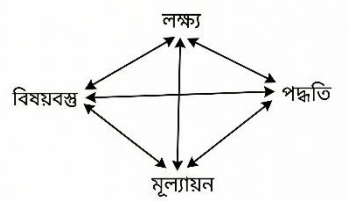

চিত্র ১: (নিকোলি ও নিকোল, ১৯৮৮)

আধুনিক শিক্ষাক্রমকে একটি চলমান ও গতিশীল চক্র হিসেবে দেখা হয়, যা এই চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। জন এফ. কের (Kerr, 1968) তার শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলে এই চারটি উপাদানকে শিক্ষাক্রমের মেরুদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেখানে 'পদ্ধতি' এর স্থলে তিনি 'শিখন অভিজ্ঞতা' এর কথা বলেছেন যা মূলত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও আরও অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি।

ক) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য: শিক্ষাক্রমের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এটি নির্দেশ করে যে একটি শিক্ষাস্তর শেষে বা একটি নির্দিষ্ট কোর্স সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা, এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন হবে।

খ) বিষয়বস্তু: উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে কী শিখতে হবে, সেটাই হলো বিষয়বস্তু। এতে তথ্য, ধারণা, তত্ত্ব, সমস্যা এবং অনুশীলনের ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গ) শিখন শেখানো পদ্ধতি: এটি হলো সেই কৌশল বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিতভাবে বিষয়বস্তু অনুসরণ করে উদ্দেশ্য অর্জন করেন।

ঘ) মূল্যায়ন: এটি শিক্ষাক্রম চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মূল্যায়ন হলো উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করার প্রক্রিয়া।

শিক্ষাক্রমের মূলনীতি

জাতীয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাক্রমের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হয়। সে বিবেচনায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হলো জনগণের চাহিদা, প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্খা। কোনো দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণীত হয়ে থাকে। আর এসব কিছুর মূল হলো জাতীয় জীবনদর্শন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি জাতির জীবনদর্শনের মধ্যেই সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রমের কাঠামো ও প্রকৃতি নিহিত থাকে। একটি দেশের শিক্ষাক্রমের কাঠামো যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা হলো -

- রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় দর্শন বা আদর্শ
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত অবস্থা
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত
- জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মূল্যবোধ
- জনগণের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস
- জনগণের সমকালীন জীবনব্যবস্থা
- দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা
- বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা
- শিক্ষার্থীর সমকালীন ও ভবিষ্যত চাহিদা
- সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
- ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা
- সমাজের জরুরি চাহিদা ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রমের ভিত্তি

শিক্ষাক্রম যে মৌলিক নীতি ও দর্শনের ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন করা হয় সেগুলোকে শিক্ষাক্রমের ভিত্তি বলা হয়। এই ভিত্তিগুলোই নির্ধারণ করে দেয় যে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য কী হবে, কীভাবে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কার্যকরভাবে শিখবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে সমাজের চাহিদা পূরণ করবে।

দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)

শিক্ষাক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো দার্শনিক ভিত্তি। মূলত দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সেগুলোর ভিত্তিতে নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। দার্শনিক ভিত্তিটা হলো, আমরা শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে কেমন মানুষ হিসেবে দেখতে চাই? আমাদের শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কী? শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ কী হবে—তা এই ভিত্তি ঠিক

করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- প্রাক-প্রাথমিক স্তরে খেলার মাধ্যমে শেখা (Play-based Learning), সৃজনশীলতার বিকাশ এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ গঠনের (যেমন: সততা, সহযোগিতা) ওপর জোর দেওয়া হয়। খেলাভিত্তিক শিখনের প্রবক্তা ফ্রয়েবেল (Froebel) বা মন্টেসরি (Montessori)-র দর্শন এই স্তরের শিক্ষাক্রমের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রাথমিক স্তরে সাম্প্রতিক দার্শনিক মতবাদগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন- শিক্ষাবিজ্ঞানে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো গঠনবাদ। গঠনবাদ অনুযায়ী শিখনের মূল উদ্দেশ্য হল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় তাই গঠনবাদের এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological foundation)

শিক্ষাক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ধরন কেমন হবে তার নির্দেশনা প্রদান করে। এটি শিক্ষাক্রমের 'কাদের' শেখাবো আর 'কীভাবে' শেখাবো- এর মূল ভিত্তি। এটা শিশুদের শিখন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে। এই ভিত্তিটি তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শিখন মতবাদের ধারণাসমূহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। বিভিন্ন শিখন মতবাদ (যেমন- আচরণবাদ, সামগ্রিকতাবাদ, সামাজিক গঠনবাদ ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করে- শিশুরা কীভাবে শেখে? তাদের মনোযোগ, স্মৃতি, বুদ্ধি এবং আবেগ কীভাবে কাজ করে? শিখন কৌশল কেমন হওয়া উচিত? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ঠিক করা হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম তৈরি হয় জ্যাঁ পিয়াজেঁ (Jean Piaget)-এর মতো মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। যেমন, ছোট শিশুরা (প্রাক-প্রাথমিক) মূর্ত অভিজ্ঞতা (Concrete Experience) থেকে শেখে। তাই তাদের হাতে-কলমে শেখানো (Hands-on Activity) বা খেলার মাধ্যমে শেখানো দরকার। শিশুরা যখন কোনো কিছু শেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়, তখনই তাদের সেই বিষয়টি শেখানো উচিত। তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ দিলে শিখন ফলপ্রসূ হয় না। পাঠদানকে মজাদার ও আনন্দময় করতে হবে, যাতে শিশুরা শিখতে উৎসাহিত হয়।

সামাজিক ভিত্তি (Sociological foundation)

শিক্ষাক্রমের সামাজিক ভিত্তিটা হলো শিক্ষাকে সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা। একটি সমাজ ও দেশের চাহিদা কী? সমাজ কী চায়? একজন নাগরিকের কী কী দক্ষতা ও মূল্যবোধ থাকা উচিত? শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় উপরের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় রাখা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রথমবার দলগতভাবে কাজ করা, নিয়ম মানা, অন্যদের সাথে মিশতে শেখা—অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতিগুলো শেখে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর থেকেই। তাই সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম কেমন হওয়া উচিত তা ঠিক করে নিতে হয়। শিক্ষাক্রমে যেন নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা (বাংলা), ইতিহাস, এবং জাতীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকে তাও লক্ষ্য রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ: স্থানীয় উৎসব, দেশীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার ইত্যাদি জানা ও পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়। সমাজ যখন প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে, শিক্ষাক্রমকেও সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে দলগত কাজ, যোগাযোগ দক্ষতা (Communication) ও সহযোগিতা (Collaboration) ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবর্তন করতে হয়।

ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical foundation)

ঐতিহাসিক ভিত্তিটা হলো 'আগে কী হয়েছিল' তার উত্তর। অর্থাৎ, অতীতের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা কী শিখেছি? অতীতের শিক্ষানীতি, শিক্ষাবিদদের অবদান এবং শিক্ষাক্রম সংস্কারের ইতিহাস এই ভিত্তি তৈরি করে।

আগে প্রাথমিক শিক্ষায় কেবল জ্ঞান ও তথ্যের ওপর জোর দেওয়া হতো। সেই দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে, এখন কীভাবে আমরা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে (Competency-Based Curriculum) এসেছি—এই ইতিহাসটা বোধগম্য হলে ভবিষ্যত পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় তার প্রতিফলন পাওয়া যাবে। পূর্বের শিক্ষাক্রম (যেমন: ২০০২ বা ২০১২) কেন সফল বা অসফল হলো—তা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন আরও ফলপ্রসূ করা যায়।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষাক্রমে আরও দুইটি ভিত্তি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার এবং প্রমাননির্ভর ভিত্তি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার (National and International Priorities)

একটি দেশের জাতীয় দলীলসমূহ হচ্ছে ঐ দেশের শিক্ষাক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১০/২০/৫০/১০০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ইত্যাদি)। একটি দেশের এসব বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও অঙ্গীকারনামা যেখানে ঐ দেশ স্বাক্ষর করেছে সেগুলোর সাথেও ভারসাম্যপূর্ণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়।

প্রমাণনির্ভর ভিত্তি (Evidence-based Foundation)

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা রিপোর্টও শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বিশেষত, যেসব শিক্ষাক্রম পূর্বে ও বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর কার্যকারিতা যাচাইমূলক যেসব গবেষণা হয়েছে সেগুলো শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

একটি ভালো শিক্ষাক্রম তৈরির জন্য এই ভিত্তিগুলো একে অপরের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে থাকে। দার্শনিক ভিত্তি ঠিক করে লক্ষ্য, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি শেখার কৌশল ঠিক করে, সামাজিক ভিত্তি বিষয়বস্তুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে, আর ঐতিহাসিক ভিত্তি শেখায়—কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার ও প্রমাণনির্ভর ভিত্তিগুলো ঠিক করে দেয় আমাদের জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের রূপরেখা।

শিক্ষাক্রমের ধরন

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ইত্যাদি পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী বাস্তবসম্মত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ জন্য এক এক দেশ কিংবা এক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রম প্রচলিত থাকতে পারে।

শিক্ষাক্রমের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ নাই। তবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধরন বা প্রকার পাওয়া যায়। অধ্যায়ের এই অংশে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধরন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাসের ওপর ভিত্তি করে দুইটি ধরন প্রচলিত রয়েছে:

ক) গতানুগতিক/ শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Teacher-Centered Curriculum)

এটি হলো সবচেয়ে পুরাতন আর প্রচলিত ধরন। **শিক্ষকই এখানে মূখ্য।** তিনি জ্ঞানের আধার, সব তথ্য পরিবেশন করেন আর শিক্ষার্থীরা শুধু শোনে। তবে এধরনের শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করা যায়। এখানে সমস্যা হলো, এটা শিক্ষার্থীর চাহিদা বা আগ্রহকে গুরুত্ব দেয় না। এর ফলে সৃজনশীলতা আর সমালোচনামূলক চিন্তার সুযোগ কমে যায়। এখানে শুধু বইয়ের বিষয়বস্তু, তথ্যের ভান্ডার আর প্রথাগত জ্ঞানের দিকেই নজর দেওয়া হয়। এখানে জ্ঞানকে ছোট ছোট ভাগে বা বিষয়ে বা ডিসিপ্লিনে (যেমন: ইতিহাস, গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান) ভাগ করা হয়। একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয়ের যোগাযোগ কম। মুখস্থ করার ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়। তাই অনেক সময় শিখনটা বিরক্তিকর লাগতে পারে।

খ) আধুনিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Learner-Centered Curriculum)

এটি আধুনিক ধারণা। এই শিক্ষাক্রমের আসল **মূল ফোকাস হলো শিক্ষার্থী**। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা আর পূর্বের অভিজ্ঞতা—এগুলোই এর মূল ভিত্তি। এখানে প্রজেক্টভিত্তিক কাজ (Project-Based Learning) করতে দেওয়া হয় বা অনুসন্ধানমূলক শিখন (Inquiry-Based Learning) করানো হয়। শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে শেখে (Learning by Doing)। সামাজিক ও আবেগিক শিখনও (Social and Emotional Learning) গুরুত্ব পায়। শিক্ষক এখানে শুধু একজন সহায়কের (Facilitator) মতো কাজ করেন। পথটা খুঁজে নিতে সাহায্য করেন, কিন্তু পথটা নিজে দেখান না। শিক্ষার্থীরা শিখতে উৎসাহ পায়, শিখন স্থায়ী হয়, আর তারা নিজেরাই শেখার দায়িত্ব নিতে শেখে (Self-Directed Learner)। সমস্যা হলো এত নমনীয়তার কারণে পুরো সিলেবাস শেষ করা কঠিন হতে পারে আর এর জন্য অনেক ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দরকার, যা সবসময় সহজলভ্য নয়।

শিক্ষাক্রমের আরও কিছু প্রচলিত ধরন-

সমস্যাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Problem-Centered Curriculum)

এই শিক্ষাক্রম মূলত শিক্ষার্থীভিত্তিক শিক্ষাক্রমেরই একটি উন্নত রূপ। এখানে ক্লাসরুমের চার দেয়ালের বাইরের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোকে শেখার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো একটা বাস্তব সমস্যা (যেমন: এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি)। ধরা যাক, শিক্ষার্থীকে কোনো একটা সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে বলা হলো। এখন সেই সমাধানের জন্য আপনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান—সব বিষয়ের জ্ঞান একসঙ্গে ব্যবহার করবেন। এটা একটা দারুণ আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) পদ্ধতি। এতে সূক্ষ্ম চিন্তা, গবেষণা দক্ষতা, দলগত কাজ আর সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেক বাড়ে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জন করে না, বরং জ্ঞানকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে শেখে। মোটকথা, এটা শিশুকে সত্যিকারের জীবনের চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করে। সব কোর্স বা স্তরের জন্য এমন সমস্যা খুঁজে বের করা এবং সেগুলোর সমাধানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাটা বেশ কঠিন।

সুপ্ত বা লুকায়িত শিক্ষাক্রম (Hidden/Implicit Curriculum)

এটা এমন এক শিক্ষাক্রম যা কোথাও লেখা থাকে না, কিন্তু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে ঠিকই শিখে যায়। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের রুটিন, সহপাঠীদের মিথস্ক্রিয়া—এসবের মাধ্যমেই এই অলিখিত শিক্ষাটা আসে। ছুটির ঘণ্টা বাজার জন্য অপেক্ষা করা থেকে শিশুরা শৃঙ্খলার ধারণা পায় বা কর্তৃপক্ষের প্রতি মনোভাব তৈরি করে। শিক্ষাবিদদের মতে, প্রকাশ্য শিক্ষাক্রমের চেয়ে এই অলিখিত শিক্ষাই তাদের মনস্তত্ত্ব, সামাজিকীকরণ এবং নৈতিকতার ওপর অনেক বেশি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে থাকে।

উদ্দেশ্যাশ্রয়ী শিক্ষাক্রম (Objective-Based Curriculum)

এই শিক্ষাক্রমে সব ফোকাস থাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে। বিশ শতকে রালফ টাইলারের হাত ধরে এই ধারণা গড়ে ওঠে। এখানে শেখার আগে ঠিক করা হয়, 'কী শেখানো হবে?' শিখন অভিজ্ঞতা আর মূল্যায়ন পদ্ধতি—সবকিছুই সেই উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় করে সাজানো হয়। সফলতার মানদণ্ডও একদম পরিষ্কারভাবে বলা থাকে। ফলে সহজেই পরিমাপ করা যায়, উদ্দেশ্য পূরণ হলো কি না। কিন্তু এতে অনেক সময় শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান বা জ্ঞানমূলক (Cognitive Domain) উদ্দেশ্য পূরণের দিকেই বেশি মনযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর আবেগ বা ব্যবহারিক দক্ষতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো অবহেলিত হতে পারে। উচ্চতর সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশও কম হতে পারে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Competency-Based Curriculum)

এই শিক্ষাক্রম আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা। এটা শুধু 'কী জানে' সেটা দেখে না, বরং 'বাস্তব জীবনে কী করতে পারে' তার ওপর জোর দেয়। যোগ্যতা মানে শুধু তথ্য নয়, এটা হলো শিশুর জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) এবং দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude)—এই তিনের মিশ্রণ (KSA Integration)। এখানে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞান অর্জন বা মুখস্ত করেনা বরং সেই জ্ঞান ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। এটা

শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে, যেখানে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। আর শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে, কারণ সবকিছুই অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও বাস্তবমুখী। বাস্তবায়ন করতে গেলে শিক্ষকের প্রচুর প্রশিক্ষণ লাগে, শ্রেণিতে পর্যাপ্ত উপকরণের সহজলভ্যতা দরকার হয়, আর মূল্যায়ন করতে অনেক বেশি সময় দিতে হয়—কারণ এটা প্রমাণভিত্তিক (Evidence-based) হয়।

শিক্ষাক্রম তৈরি করা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা যা শেখে তা তিন ধাপে চলে। বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের ধরন-

ক) উদ্দেশ্যভিত্তিক/ শিক্ষাক্রম (Intended/Official Curriculum)

এটা হলো লিখিত শিক্ষাক্রম। নীতিনির্ধারকরা (যেমন NCTB) গবেষণা করে, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনের সমন্বয়ে এটা তৈরি করেন। এটা একটা ব্লু-প্রিন্টের মতো—আদর্শগতভাবে যা অর্জন করা সম্ভব, তার পুরো পরিকল্পনা এতে থাকে।

খ) বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম (Implemented/Taught Curriculum)

এটা হলো ক্লাসরুমে যা ঘটে। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সৃজনশীলতা, আর স্কুলের উপকরণ ব্যবহার করে ব্লু-প্রিন্টটাকে বাস্তববায়ন করার প্রচেষ্টা করেন। এইটাকে তাই 'শিক্ষকের হাতে থাকা শিক্ষাক্রম' ও বলা যায়। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষাক্রমে যা লেখা থাকে, তা সব সময় হুবহু বাস্তবায়ন করা যায় না। যতটুকু বাস্তবায়ন করা হয় সেটাই বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম।

গ) অর্জিত শিক্ষাক্রম (Attained/Learned Curriculum)

এটা হলো শিক্ষার্থী আসলে যা শিখল। মূল্যায়নের মাধ্যমে এটা যাচাই করা হয়। এটা শুধু নম্বর নয়, বরং শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা আর আচরণগত পরিবর্তনকেও বোঝায়। ক্লাসে যা পড়ানো হলো আর শিক্ষার্থীরা যা শিখল—এই দুটো ধাপের মধ্যে পার্থক্য যত কম হবে, শিক্ষাক্রম তত সফল! এই ব্যবধান কমানোটাই এখনকার প্রধান চ্যালেঞ্জ। শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের পর উদ্দেশ্যের যেটুকু শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারলো সেটাই অর্জিত শিক্ষাক্রম।

আমাদের দেশে বর্তমানে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রচলিত আছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে এখন আর শুধু জ্ঞান মুখস্থ করা নয়, বাস্তব জীবনে সেই জ্ঞানটা কাজে লাগানোই আসল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখনে যুক্ত হয়ে শিখে। শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষা নয় বরং ধারাবাহিক মূল্যায়নকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমরা জানতে পারি, শিশুরা আসলে কী শিখছে আর কী দক্ষতা অর্জন করছে। এটা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন তাত্ত্বিক মডেল নিয়ে আলোচনা করেছেন। টাইলার, হিলদা তাবা, হুইলার, জন কার, ওয়াকারসহ অনেকেই শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মডেল প্রস্তাব করেন। এগুলো যেকোনো দেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এককভাবে এ মডেলগুলো কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কিন্তু একে অপরের পরিপূরক। একটি দেশের সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন মডেল থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ দেশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মডেল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

এখানে আমরা টাইলার ও হুইলারের মডেল দুইটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো। এ দুইটি মডেলসহ অন্যান্য মডেল সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত তথ্যপঞ্জীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

টাইলারের সরলরৈখিক মডেল

রালফ টাইলার (Ralph W. Tyler) ১৯৪৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Basic Principles of Curriculum and Instruction'-এ এই মডেলটি উপস্থাপন করেন। এটি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সবচেয়ে সরল ও প্রভাবশালী মডেল, যা মূলত

যৌক্তিক বা উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective-based) মডেল হিসেবে পরিচিত। টাইলারের মতে, শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষাবিদদের চারটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। এ প্রশ্নগুলো হচ্ছে-

(ক) শিক্ষার্থী কী কী শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জন করবে?

(খ) শিক্ষার্থী কী কী শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জন করবে?

(গ) এ সকল শিখন অভিজ্ঞতা কী উপায়ে সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে?

(ঘ) উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কী না তা কীভাবে যাচাই করা যাবে?

এই প্রশ্নগুলো থেকেই পরবর্তিতে তার চারস্তরবিশিষ্ট সরলরৈখিক শিক্ষাদক্রম মডেল উন্নয়ন হয়। এস্তরগুলো হচ্ছে-

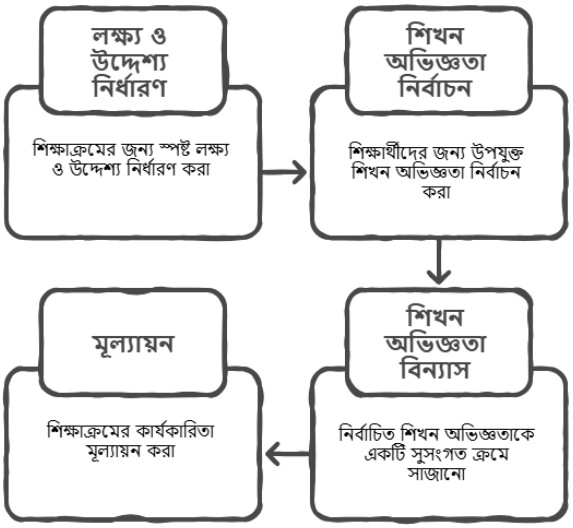

চিত্র: ১ টাইলারের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

কী কী শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে? এটি হলো শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ধাপ। এখানে সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত ও সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলোই সমগ্র শিক্ষাক্রমকে পরিচালিত করে।

২. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন

কী কী শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় উল্লেখিত উদ্দেশ্য অর্জন করবে? উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর, শিক্ষক নির্বাচন করেন যে শিক্ষার্থীরা কীভাবে হাতে-কলমে বা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে পারে। এখানে শুধু বিষয়বস্তু নয়, বরং পাঠদান পদ্ধতি, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম, এবং পরিবেশের অভিজ্ঞতাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. শিখন অভিজ্ঞতা বিন্যাস

সকল শিখন অভিজ্ঞতা কী উপায়ে সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে? নির্বাচিত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে সাজাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বীজগণিতের সরল ধারণা থেকে জটিল সমীকরণের দিকে অগ্রসর হওয়া হলো ধারাবাহিকতা, আর গণিতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হলো সমন্বয়।

৪. মূল্যায়ন

উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কী না তা কীভাবে যাচাই করা যাবে? এটি হলো মূল্যায়নের ধাপ। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের শুরুতে যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না, কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়। এই ধাপের মাধ্যমে মূলত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়।

হইলারের শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়া মডেল

ডি. কে. হুইলার (D. K. Wheeler) ১৯৬৭ সালে তাঁর 'Curriculum Process' গ্রন্থে এই মডেলটি উপস্থাপন করেন। টাইলারের মডেলের সরলরৈখিক প্রকৃতির দুর্বলতা দূর করে তিনি এটিকে একটি গতিশীল ও নমনীয় চক্রাকার (Cyclical) রূপ দেন। হুইলারের মডেলের পাঁচটি ধাপ আছে যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটি ধাপ অপরটির উপর নির্ভরশীল।

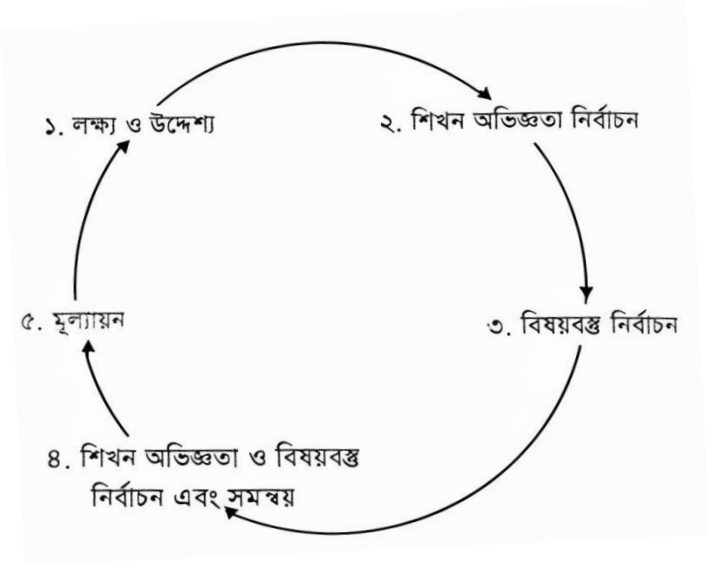

চিত্র ১: হুইলারের কারিকুলাম প্রক্রিয়া মডেল

হুইলারের মডেলে প্রথম চারটি ধাপ টাইলারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও, এর পঞ্চম ধাপ প্রক্রিয়াটিকে আবার প্রথম ধাপে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যা শিক্ষাক্রমকে ক্রমাগত উন্নত করার সুযোগ দেয়।

১. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্বাচন- প্রথম ধাপে ব্যাপক জাতীয় লক্ষ্য (Aims), সাধারণ উদ্দেশ্য (Goals), এবং সুনির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্য (Objectives) চিহ্নিত করা হয়।

২. শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন- এই ধাপে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন করা হয়।

৩. বিষয়বস্তুর নির্বাচন- শিখন অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান ও তথ্যের সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়।

৪. শিখন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সমন্বয় - এখানে ধারাবাহিকতা, সমন্বয় এবং অনুক্রম (Sequence) বজায় রেখে অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু সাজানো হয়।

৫. মূল্যায়ন (Evaluation)- এটি শিক্ষাক্রম চক্রের শেষ ধাপ। এখানে উদ্দেশ্য অর্জন পরিমাপ করা হয়। এই মডেলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো- মূল্যায়নের ফলাফল সরাসরি চক্রের প্রথম ধাপে (লক্ষ্য নির্ধারণ) নিয়ে যায়, যা শিক্ষাক্রমের দুর্বলতা

চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার সুযোগ দেয়। একে ফিডব্যাক লুপ (Feedback Loop) বলা হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা সমাজ, জ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য নিয়মিতভাবে উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বা ১০ বছর অন্তর এই পরিমার্জনের কাজ হয়ে থাকে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

জ্ঞান ও গবেষণার অগ্রগতি: নতুন বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা এবং অপ্রাসঙ্গিক বা পুরোনো তথ্য বর্জন করা।

কার্যকারিতা মূল্যায়ন: পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন ও অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে এর কার্যকারিতা যাচাই করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সাধারণ ধাপসমূহ

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কার্যক্রম সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী হয়। এ ক্ষেত্রে সূচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। কয়েকটি ধাপে তা সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যদিও সময়ে সময়ে এই ধাপসমূহও পরিবর্তিত হতে পারে। নিচে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের সাধারণ ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো -

বাংলাদেশ	থাইল্যান্ড	দক্ষিণ কোরিয়া	মালয়েশিয়া
১. জাতীয় দর্শন ও নীতিমালা পর্যালোচনা;	১. বর্তমান সমস্যা ও চাহিদা বিশ্লেষণ;	১. জরিপের মাধ্যমে বর্তমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকরণ;	১. প্রয়োজনীয়তা নিরূপন;
২. শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পর্যালোচনা;	২. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ;	২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ;	২. পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা ও পুনঃ নির্ধারণ;	৩. বিষয়বস্তু নির্বাচন;	৩. উদ্দেশ্য নিরূপন;	৩. কার্যক্রম প্রণয়ন (উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি)
৪. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপণ;	৪. বিষয়বস্তু বিন্যাসকরণ;	৪. বিষয়বস্তু নির্বাচন;	৪. প্রাক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ;
৫. বিষয় ও শ্রেণি ভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন	৫. শিখন শেখানো কার্যাবলি নির্বাচন;	৫. বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা;	৫. বাস্তবায়ন ও
৬. শিখন ফল প্রণয়ন;	৬. শিখন শেখানো কার্যাবলি বিন্যাসকরণ এবং	৬. বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যোগান নিশ্চিতকরণ এবং	৬. মূল্যায়ন

৭. পাঠ্যসূচি রচনা;	৭. মূল্যায়ন।	৭. কার্যক্রম মূল্যায়ন।	-
৮. লেখক ও সম্পাদকবৃন্দের নির্দেশনা প্রণয়ন;	-	-	-
৯. বিষয়বস্তু রচনা, মূল্যায়ন ও সম্পাদনা;	-	-	-
১০. চাকুরীকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ও চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণ	-	-	-
১১. মূল্যায়ন।	-	-	-

[সূত্র: মালেক ও অন্যান্য, ২০১৪]

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি ধাপের একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া সাধারণত অনুসরণ করা হয়ে থাকে:

১. **চাহিদা নিরূপণ ও লক্ষ্য নির্ধারণ:** অংশীজনদের (শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক, শিল্প প্রতিনিধি ইত্যাদি) সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের নতুন ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় (যেমন: মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতার ওপর জোর দেওয়া)।

২. **কাঠামো ও বিষয়বস্তু প্রণয়ন:** নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা, শিখন কৌশল এবং মূল্যায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

৩. **বাস্তবায়ন:** প্রণীত শিক্ষাক্রমকে পরীক্ষামূলকভাবে এবং পরবর্তীতে বৃহৎ পরিসরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করা হয়। বাস্তবায়নের পূর্বে শিক্ষকদের নতুন পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা অপরিহার্য।

৪. **মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক:** নতুন শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয় (শিক্ষার্থীর শিখন ফলাফল, শিক্ষকের স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি)। মূল্যায়নের ফলাফল থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পরবর্তী পরিমার্জনের জন্য প্রথম ধাপে পুনরায় ব্যবহৃত হয়। এই চক্রটিই শিক্ষাক্রমের চলমান উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এই পরিমার্জনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে। সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি ১০ বছর অন্তর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা হয়ে থাকে। এনসিটিবি সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করেছে (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০২১)-

১. গবেষণা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চাহিদা নিরূপণ: জাতীয় শিক্ষানীতি, সংবিধান, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারনামার আলোকে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সমন্বয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় সংশোধন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়ন: গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য অংশীজনদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় যার আলোকে পরবর্তীতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২. খসড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন (Drafting): জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে বিশেষজ্ঞ প্যানেল নতুন শিখনফল, বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়নের কৌশলসহ শিক্ষাক্রমের একটি খসড়া তৈরি করেন।

৩. মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Field Testing/Pilot Run): খসড়া শিক্ষাক্রমটি বৃহত্তর পরিসরে চালু করার পূর্বে দেশের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষামূলকভাবে (Pilot) প্রয়োগ করা হয়। এই ধাপে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে গঠনমূলক মতামত (Feedback) সংগ্রহ করা হয়, যা নীতিনির্ধারণী সমস্যা চিহ্নিত করতে সহায়ক।

৪. চূড়ান্ত অনুমোদন ও প্রস্তুতি (Finalization and Preparation): মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক অনুযায়ী খসড়াটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত শিক্ষাক্রমটি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এরপর নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষক সহায়িকা (Teachers' Guide) প্রস্তুতকরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়।

৫. ব্যাপক বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ (Mass Implementation and Monitoring): চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত শিক্ষাক্রমটি দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়।

এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করে যে, শিক্ষাক্রম যেন সর্বদা দেশ ও জাতির প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।

শিক্ষাক্রমের উপাদান, নীতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন একজন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সরাসরি সহায়তা করে। এই অধ্যায়টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষাক্রমের তাত্ত্বিক ধারণা থেকে শুরু করে এর বাস্তব প্রয়োগ এবং ধারাবাহিক পরিমার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ও সুসংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবেন। এই মৌলিক জ্ঞান অর্জন নতুন শিক্ষাক্রমের দর্শনকে আন্তরিকতার সাথে ধারণ করতে এবং শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতায় তা সুচারুভাবে প্রতিফলিত করতে অপরিহার্য।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. এহসান, ড. মোঃ আবুল, (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২১), জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি), এনসিটিবি।

৩. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর, (২০০৮), মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ. প্রভাতী লাইব্রেরি।

৪. https://archive.org/details/basicprincipleso00tyle_0/mode/1up

অধ্যায় ২
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম কোনো দেশের শিক্ষার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সামগ্রিক রুপরেখা। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্তরে শিশু প্রথমবারের মতো সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত শেখার পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন তথা শিশুরা যেন কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সেলক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এঅধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের উপাদানসমূহ, আবশ্যকীয় শিখনক্রম, বিস্তৃত শিক্ষাক্রম এবং পৃথকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও বৈশ্বিক অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৬ সালে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সময়ে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে প্রাথমিক স্তরের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়। এবং ১৯৮৮ সালে এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হওয়ার পর শিক্ষানীতির আলোকে ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালে শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্নস্তরের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এ শিক্ষাক্রমের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, মূলনীতি , মূলযোগ্যতা, শিখন-ক্ষেত্র, বিষয়সমূহ, শিখনসময়, শিখন শেখানো কৌশল, শিখন-সামগ্রী, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিদৃত করা হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় ২০২৫ সালে যুগের পরিবর্তনের সাথে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) আবার পরিমার্জন করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় "জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১- প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত-২০২৫)"।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কী ধরনের শিখন আচরণ তথা দক্ষতা যোগ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করা হয় তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাই হলো শিক্ষাক্রমের রূপকল্প। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি পরস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণ ও প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ শীর্ষক সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাক্রমের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, মূল যোগ্যতা ও যোগ্যতার বিভিন্ন উপাদান নির্ধারণ করে থাকেন।

রূপকল্প

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা"।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি লালনকারী সৎ, নৈতিক, মূল্যবোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, সৃজনশীল ও সুখী একটি প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্যে রূপকল্পটি নির্ধারিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম স্বকীয়তা বজায় রেখে অপরের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে স্বাগত জানিয়ে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

অভিলক্ষ্য

শিক্ষার মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জনে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম এবং তার বাস্তবায়নে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিছু কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করা। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভীলক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র;
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি;
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা;
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি।

মূল যোগ্যতা

শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য দশটি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে-

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও দূর্যোগ মোকাবিলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিখনক্ষেত্র

শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখনক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে। যোগ্যতাগুলো অর্জনকল্পে শিক্ষাক্রমে যেসকল শিখনক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো-

১. ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication)
২. গণিত ও যুক্তি (Mathematics & Reasoning)
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology)
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি (Digital Technology)
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment & Climate)
৬. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব (Society & Global Citizenship)
৭. জীবন ও জীবিকা (Life & Livelihood)
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Values & Morality)
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (Physical & Mental Health and Protection)
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি (Arts & Culture)

মূলযোগ্যতা অর্জনের জন্য উল্লেখিত শিখনক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: মূলযোগ্যতা ১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা। এই যোগ্যতা মূলত ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের মাধ্যমে এই যোগ্যতাটি অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো মূল যোগ্যতা একাধিক শিখনক্ষেত্রের মাধ্যমে অর্জনের সুযোগ যেমন রয়েছে, আবার কোনো কোনো শিক্ষনক্ষেত্রের মাধ্যমে একাধিক মূলযোগ্যতারও কিছুটা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

শিখনক্ষেত্র ভিত্তিক যোগ্যতা

একটি নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যে যোগ্যতা অর্জন করবে সেটাই শিখনক্ষেত্র ভিত্তিক যোগ্যতা। শিক্ষাক্রমের দশটি শিখনক্ষেত্রের প্রতিটি শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কী যোগ্যতা অর্জন করবে তাও শিক্ষাক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনক্ষেত্র ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ-

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (অপারেশন), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্যবিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সাথে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।

৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।
৫. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামত বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাককর্ম যোগ্যতা অর্জন করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখিনতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা অজর্ন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ূ	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভ‚মিকা রাখতে পারা।
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চচার্র মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আনন্দ লাভ করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

তথ্যসূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১

শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মূল যোগ্যতা, শিখনক্ষেত্রভিত্তিতে যোগ্যতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের প্রস্তুতি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরের শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর কতটুকু আচরণিক পরিবর্তন, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায় তা শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতায় সুনির্দিষ্ট করা হয়। শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতার বিবরণ-

শিখন-ক্ষেত্র	শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতার বিবরণী
১. ভাষা ও যোগাযোগ	১. একাধিক ভাষায় কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা শুনে এবং পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয়বস্তু পড়ে এবং বুঝে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া। ২. পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ব্যবহার করে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে মনোভাব ও অনুভুতি সহজ, সঠিক ও কার্যকরভাবে নানান মাধ্যমে প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে পারা। ৩. গল্প, কবিতা, ছড়াসহ সৃজনশীল রচনা শুনে ও পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারা; এবং আবৃত্তি ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা।
২. গণিত ও যুক্তি	১. গাণিতিক সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) ধারণা লাভ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করা। ২. জ্যামিতিক আকৃতি ও বিভিন্ন ধরণের পরিমাপের ধারণা লাভ করে প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যবহার করতে পারা। ৩. পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক যোগাযোগের (মিথষ্ক্রিয়া) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করা। ৪. দৈনন্দিন জীবনে সৃজনশীলতার সাথে ইতিবাচক ও যৌক্তিকভাবে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১. চারপাশের পরিবেশ, প্রাকৃতিক ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারা। ২. বাড়ি, বিদ্যালয় ও নিকট পরিবেশের প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ চিহ্নিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমুহ জেনে ও অনুশীলন করে সৃজনশীল উপায়ে কল্যাণকর সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১. তথ্য, যোগাযোগ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অব্যাহত বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকা, নিত্যনতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানাক্ষেত্রে এর নিরাপদ, ইতিবাচক, কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

৫. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	১. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সম্প্রীতিবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা চর্চা করা। ২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। ৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং এর আন্তসম্পর্ক বুঝতে পারা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৬. জীবন ও জীবিকা	১. ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা-সহ (সঠিক খাদ্যাভাস, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, যোগাযোগ দক্ষতা, অভিযোজন ক্ষমতা, নেতৃত্ব, অভিযোজন ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, শুদ্ধাচার, আত্ম ব্যবস্থাপনা) নিজেকে প্রস্তুত করা। ২. সকল বৃত্তি ও পেশার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা, সমাজ গঠনে সকলের অবদান উপলব্ধি করতে পারাও কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী হওয়া। ৩. আর্থিক সাক্ষরতা (দৈনন্দনি হিসাব-নিকাশ, লেনদেন, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার, সঞ্চয়ী মনোভাব) অর্জন এবং প্রাত্যাহিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ূ	১. প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদির গুরুত্ব ও আন্তঃসম্পর্ক বুঝে মানব সমাজ ও বাস্তুসংস্থান টিকিয়ে রাখায় এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসতে পারা। ২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু দূষণের কারণ ও প্রতিকার, দুর্যোগ, পরিবেশের প্রতিকুলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারা। ৩. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ, পরিমিত ও পুনঃব্যবহার করতে পারা।
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	১. নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন অনুশীলনের মাধমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়া। ২. নৈতিক গুণাবলি (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সদাচার, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ) অর্জন এবং ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়ে ব্যাক্তি, পরিবার, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তা চর্চা করা। ৩. মানুষ-প্রকৃতি-জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রদর্শন করা।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	১. শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে স্বাস্থ্যবিধি (ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা), খাদ্য ও পুষ্টি, সাধারণ রোগ প্রতিকার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি মেনে স্বাস্থ্যসম্মত, সুরক্ষিত ও নিরাপদ জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া। ২. মানসিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে এর পরিচর্চার (আত্মসচেতনতা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, আবেগ ব্যবস্থাপনা, সুস্থ বিনোদন চর্চা ইত্যাদি) মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া।

১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	১. ছবি আঁকা, ছড়া, কবিতা, গল্প, গান, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি লালন করতে সক্ষম হওয়া। ২. চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নান্দনিকতাবোধ অর্জন করে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হওয়া। ৩. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি (রূপকথা, গান, গল্প, লোকাচার, খেলা, চলচ্চিত্র, উৎসব, খাবার ইত্যাদি) সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করে লালন ও চর্চা করা।

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)

প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থী মূল যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সমর্থ হবে মূলত নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই। যেমন: ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রে শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যে যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে একজন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী এই যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই মূলত মূল যোগ্যতা (১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা) অর্জনে সমর্থ হবে।

বিষয় নির্ধারণ

নির্ধারিত দশটি শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে আটটি বিষয়ে পাঠ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ এবং বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ের সংখ্যা এবং ধরনও ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই আটটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতা গুলো অর্জনে সমর্থ হবে। কোনো একটি শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতা একাধিক বিষয়ের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে পারে আবার কোনো একটি বিষয়ে একাধিক শিখনক্ষেত্রের যোগ্যাতা অর্জনের সুযোগ থাকতে পারে অর্থাৎ ক্রসকাটিং হতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত মূল যোগ্যতাসমূহ এবং তার ধারাবাহিকতায় শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সমর্থ হয়, কিন্তু একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর চাপ যাতে না বারে সেজন্য থিমভিত্তিক ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিচের ছকে প্রাথমিক স্তরের বিষয়সমূহের বিন্যাস দেয়া হলো-

শিখন-ক্ষেত্র	প্রাথমিক স্তরের বিষয়
১. ভাষা ও যোগাযোগ	বাংলা
	ইংরেজি
২. গণিত ও যুক্তি	গণিত
৩. জীবন ও জীবিকা	প্রাথমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
৪. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	সামাজিক বিজ্ঞান
৫. পরিবেশ ও জলবায়ূ	প্রাথমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বিজ্ঞান
৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি	বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
৮. শারীরিকও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
৯. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ধর্ম শিক্ষা ও ক্রস কাটিং হিসেবে অন্যান্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

আগেই বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতাগুলো বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে অর্জন করবে। অর্থাৎ শিখনক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা প্রাথমিক স্তরের নির্ধারিত আটটি বিষয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। কিন্তু কোনো কোনো যোগ্যতা ক্রসকাটিং আবার শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতাগুলোর আওতা ব্যাপক। এ কারণে শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতাকে বিবেচনা নিয়েই বিষয়ের জন্য আবার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে যা একজন শিক্ষার্থী ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে অর্জন করবে। প্রাথমিক স্তরে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে বা প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে যে যোগ্যতা অর্জন করবে সেটাই হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা। যেমন, গণিত বিষয়ের একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা- ১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সংখ্যা একরকম নয়। "জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১- প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত-২০২৫)" এ বিভিন্ন বিষয়ে যে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে-

বিষয়	বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা
বাংলা	১৬টি
ইংরেজি	৯টি
গণিত	৮টি
সামাজিক বিজ্ঞান	১০টি
বিজ্ঞান	৭টি
ধর্ম	ইসলামধর্ম-৫টি, হিন্দুধর্ম-৫টি, বৌদ্ধ ধর্ম-৫টি, খ্রিষ্টধর্ম-৫টি
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	৫টি
শিল্পকলা	৪টি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

কোনো একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা একবারে বা একসঙ্গে কোনো একটি শ্রেণিতে অর্জন করা যায় না। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার অংশবিশেষ ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণিতে অর্জনের মাধ্যমে পুরো বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে অর্জন করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজিত রূপকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বলে। যেমন: গণিত বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা- ১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা। এই বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার ১ম শ্রেণির জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা হচ্ছে- ১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা। ১.২ গণনার ধারণা লাভ করে উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু গণনা করতে পারা। এভাবে কয়েকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাজন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করে। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার কোনো অংশ বা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, ১ম শ্রেণিতে শুরু হয়ে ৩য় বা ৪র্থ যেকোনো শ্রেণিতে শেষ হতে পারে আবার কোনো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ২য়, ৩য় বা ৪র্থ যেকোনো শ্রেণিতে শুরু হয়ে এর বিভাজনটা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত চলতে পারে। আমরা শিখনক্রম দেখলে এটা আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবো।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

কোনো একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেণিভিত্তিক প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐ যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রম বিন্যাসকে শিখনক্রম বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু বা কোন অংশ শিক্ষার্থীরা কোন শ্রেণিতে অর্জন করবে তার ধারাবাহিক এবং ক্রমবর্ধমান বিন্যাসিত রূপই হলো শিখনক্রম। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিশুর সামর্থ্য ও চাহিদার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতাগুলো আটটি বিষয়ের শিখনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীই প্রণীত শিখনক্রমের যোগ্যতাগুলো পুরোপুরিভাবে অর্জনের সুযোগ পাবে এজন্য এ শিখনক্রমকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে গণিত বিষয়ের একটি যোগ্যতার শিখনক্রম দেয়া হলো-

আবশ্যকীয় শিখনক্রম
প্রাথমিক গণিত

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১. সংখ্যার ধারণা লাভকরে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।	১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।	---	---	---	---
	১.২ গণনার ধারণা লাভ করে উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু গণনা করতে পারা।	---	---	---	---
	১.৩ সংখ্যা গণনা করতে, পড়তে, লিখতে ও তুলনা করতে পারা এবং উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।	১.৩ সংখ্যা গণনা করতে, পড়তে, লিখতে ও তুলনা করতে পারা এবং উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারা।	---	---	---
	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা লাভকরে তা যথাযথভাবে	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা লাভ করে বিভিন্ন গাণিতিক	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা ব্যবহার করে সংখ্যা	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা ব্যবহার করে সংখ্যা পড়া, অঙ্কে	---

	ব্যবহার করতে পারা।	সমস্যা সমাধানে তা প্রয়োগ করতে পারা।	পড়তে, লিখতে ও সংখ্যার তুলনা করতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা ও ব্যবহার করতে পারা।	ও কথায় লিখতে পারা এবং সংখ্যার তুলনা করতে পারা ও ক্রমানুসারে সাজাতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা ও ব্যবহার করতে পারা।	
	---	১.৫ ক্রমবাচক সংখ্যা পড়তে, লিখতে ও উৎসাহের সঙ্গ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারা।	১.৫ ক্রমবাচক সংখ্যা পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারা।	---	---
	১.৬ উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার প্যাটার্ন খুঁজে বের করে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা।	১.৬ শিশুর নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও সংখ্যার মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা এবং সংখ্যার প্যাটার্ন তৈরি করে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে যৌক্তিক চিন্তা করতে পারা।	১.৬ উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও সংখ্যার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা এবং সংখ্যার প্যাটার্ন তৈরি করে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা।	১.৬ সংখ্যাকে যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারা ও যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারা।	---

বিস্তারিত জানার জন্য ‘প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)’ এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

শিখনফল

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর আচরণের কিছু কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করা। আর এই আরচণগত পরিবর্তন বলতে বোঝায়- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন। কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিবৃতিই হলো শিখনফল। শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করে। শিখন শেখানো কার্যাবলি শিখনফলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। শিখনফল শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের পরিবর্তন প্রকাশ করে থাকে। তাই এ শিখনফল অর্জিত হলো কি না তা সহজেই পরিমাপ করা যায়। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে ভেঙ্গে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তৈরি করা হয় এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে বিভাজন করে শিখনফল প্রণীত হয়। যেমন- গণিত বিষয়ের ১নং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা- ১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন

প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা। এই বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার ১ম শ্রেণির জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা হচ্ছে- ১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।

উক্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে যে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হলো-

১.১.১ কম-বেশি তুলনা করতে পারবে।

১.১.২ ছোট-বড় তুলনা করতে পারবে।

১.১.৩ খাটো-লম্বা তুলনা করতে পারবে।

১.১.৪ কাছে-দূরে নির্ণয় করতে পারবে।

১.১.৫ হালকা-ভারি তুলনা করতে পারবে।

১.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে উৎসাহী হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে বিভাজন করে বা যোগ্যতা অর্জনের জন্য ছয়টি শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে একাধিক শিখনফল তৈরি করা হয়। এবং শিখনফলে সাধারণত একটিমাত্র আচরণিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকে। ক্রিয়াবাচক শব্দে এবং একটিমাত্র বাক্যে শিখনফল লিখতে হয়। শিখনফল সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হয়।

বিষয়বস্তু

শিখনফল অর্জনের জন্য শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সাথে কী আলোচনা হবে বা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কী কার্যক্রম করা হবে, যা পূর্বে থেকেই শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত থাকে সেটাই হচ্ছে বিষয়বস্তু। বিষয়ভিত্তিক শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তু রচিত হয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ থাকে। বিষয় সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কোনো নির্দিষ্ট পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়। এগুলো নির্ধারণ করা হয় বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিভাজন করে যেমন শিখনফল প্রণয়ন করা হয় আবার শিখনফলের উপর ভিত্তি করে তা অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু রচিত হয়। যেমন: ১ম শ্রেণির গণিত বিষয়ের শিখনফল '১.১.১ কম-বেশি তুলনা করতে পারবে' অর্জনের জন্য ১ম শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে বিষয়বস্তু হিসেবে 'তুলনা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিখন শেখানো একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য ধারাবাহিক যে প্রক্রিয়া বা পন্থা ব্যবহার করা হয় বা কৌশলের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকেই শিখন শেখানোর পদ্ধতি বলা হয়। একটি বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে কীভাবে উপস্থাপিত হবে বা কোন প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করলে শিখনফল অর্জিত হবে তা শিক্ষাক্রমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)'-এ বিষয়বস্তুর আলোকে নির্ধারিত বিষয়বস্তু উপস্থানের জন্য শিখন শেখানো কার্যাবলি হিসেবে পদ্ধতি ও কৌশল এবং পরিকল্পিত কাজের উল্লেখ রয়েছে। যেমন: ১ম শ্রেণিতে গণিত বিষয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে 'তুলনা' উপস্থাপনের জন্য শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত কাজ হিসেবে ছবি দেখে নিজের মতো করে বলা, পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ এবং তুলনা করা ইত্যাদি উপস্থাপনের জন্য পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে ছবি সম্পর্কে বলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন এবং আলোচনা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থী শিখনের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে মুল্যায়ন। অর্থাৎ শিখন শেখানো কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন বা শিখনফল অর্জনের মাত্রা যাচাই করার প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন বলে। 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)'-এ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিবেচনায় গাঠনিক ও সামষ্টিক এই দুই ধরণের মূল্যায়নের নির্দেশনা রয়েছে। শিখনফলের আলোকে যে বিষয়বস্তু নির্ধারিত এবং সে বিষয়বস্তু শ্রেণিতে

উপস্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন যাচাই করার প্রক্রিয়া কী হবে তার নির্দেশনাও শিক্ষাক্রমে দেয়া থাকে। অর্থাৎ শিখনফল যাচাইয়ের কৌশল বা মূল্যায়নের নির্দেশনাও 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)' শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে রয়েছে।

শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো কার্যক্রম এবং মূল্যায়ন, প্রতিটি উপাদানের ধারাবাহিকতা নিচের ছকে দেখানো হলো:

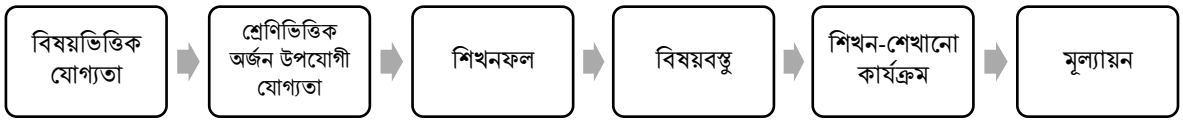

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)'-এর বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো কার্যক্রম এবং মূল্যায়নের নির্দেশনা সন্নিবেশিত আছে। একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে বিভাজন করে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তু এবং বিষয়বস্তুর বিবেচনায় শিখন শেখানো কার্যক্রম (পদ্ধতি ও কৌশল এবং পরিকল্পিত কাজ) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফল, বিষয়বস্তু ও শিখন শেখানো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনাও বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে রয়েছে। প্রতিটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)'-এর বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের কাঠামো পর্যবেক্ষণ করলে আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে। উদাহরণ হিসেবে গণিত বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ দেয়া হলো-

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম
প্রাথমিক গণিত
প্রথম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো কার্যাবলি		মূল্যায়ন নির্দেশনা	
				পদ্ধতি ও কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস
১. সংখ্যার ধারণা লাভকরে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে	১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।	১.১.১ কম-বেশি তুলনা করতে পারবে। ১.১.২ ছোট-বড় তুলনা করতে পারবে। ১.১.৩ খাটো-লম্বা তুলনা	তুলনা	ছবি সম্পর্কে বলা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন আলোচনা	ছবি দেখে নিজের মতো করে বলা। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ এবং তুলনা করা। ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস তুলনা ও পার্থক্য করা।	পর্যবেক্ষণ মৌখিক	চেকলিস্ট প্রশ্নমালা

সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।		করতে পারবে।					
		১.১.৪ কাছে-দূরে নির্ণয় করতে পারবে।					
		১.১.৫ হালকা-ভারি তুলনা করতে পারবে।					
		১.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে উৎসাহী হবে।					

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম বিস্তারিত জানার জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫)' এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

বর্তমান শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায়ও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী দুই বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারণ করেছে। পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্বে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক যাবতীয় শিক্ষা ও বিকাশমূলক কার্যক্রমকে বোঝাতো। তবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির জন্য নয় বরং শিশুর সারাজীবনের শিক্ষার ভিত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাবৃত্তিক এবং সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে সারাদেশে ৩-৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় মানের ওপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো" প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে

অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরর্বতী সময়ে একই ধারাবাহিকতায় সরকার ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি অনুমোদন করে। সারাদেশে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে ২০২৩ সালে নির্বাচিত ৩২১৪ টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২১ সালের জুন মাস থেকে ৪+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং ৫+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ শুরু করে। ৪+ বয়সিদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং ৫+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান;
- জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০;
- বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন শেখানো সামগ্রী;
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards);
- প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি -২০১৩ (Comprehensive Early Childood Care and Development Policy-2013);
- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের গুণগত মান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর আলোকে "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫)" -এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

'আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা'।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

শিখনক্ষেত্র

শিশুর সার্বিক বিকাশকে ৪টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে যেগুলো একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষেত্রগুলো হলো শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। প্রাক-প্রাথমিক ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বিকাশের ক্ষেত্রকে ৯টি শিখনক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন-

- শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
- সামাজিক ও আবেগিক
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
- ভাষা ও যোগাযোগ
- গণিত ও যুক্তি
- সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
- পরিবেশ ও জলবায়ু
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

বিকাশের ক্ষেত্রকে যে ৯টি শিখনক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে সেই প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখন ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই শিশুর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিকাশ সাধিত হবে যা প্রাক-প্রাথমিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উল্লেখ রয়েছে। "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫)"-এ ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের শিখনক্ষেত্র অনুযায়ী অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিম্নরুপ-

শিখনক্ষেত্র ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখনক্ষেত্র	৪+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১.শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশি ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করতে পারা ।	১.২ সূক্ষ্মপেশি ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করতে পারা ।
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা ।	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা ।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা ।	২.১ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা ।
	২.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশিদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ নিকটজনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুর কাছে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।

৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা করা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে দৈনন্দিন কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা করা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা করতে পারা।	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তা অনুসরণ করতে পারা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ	৪.১ ভাষা ও যোগাযোগের উপায়সমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ করা এবং নিজের মত করে প্রকাশ করতে পারা।	৪.১ ভাষা ও যোগাযোগের উপায় সমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ করা এবং নিজের মত করে প্রকাশ করতে পারা।
	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে বস্তুর রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ সনাক্ত করে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারা।	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে বস্তুর রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ সনাক্ত করে তথ্য আদান প্রদান করতে পারা।
৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব ও অর্ধ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ-বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
		৫.২ বাস্তব, অর্ধবাস্তব উপকরণ ও সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করে গণনা, সংখ্যার তুলনা এবং যোগ বিয়োগ করতে পারা
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে কাজের মাধ্যমে নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারা।	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে কাজের মাধ্যমে নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

	৭.৩ নিকট পরিবেশের উপাদানের প্রতি যত্নশীল হয়ে সংরক্ষণ করতে পারা।	৭.৩ নিকট পরিবেশের উপাদানের প্রতি যত্নশীল হয়ে সংরক্ষণ করতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীব শনাক্ত করতে পারা।	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা নিকটজনকে জানাতে পারে।	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা জানাতে পারে।
	৯.৩ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারে।	৯.৩ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারে।

শিখনফল

প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভেঙ্গে শিখনফল তৈরি করা হয়েছে। শিখনক্ষেত্র অনুযায়ী অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে শিখনফল এবং শিখনফল অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম নির্ধারন করা হয়েছে। যেমন- একটি শিখনক্ষেত্র হচ্ছে- ১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা। এর কয়েকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে, একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা হলো- ১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা, এবং এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতার জন্য তিনটি শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-

১.১.১ অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে ।

১.১.২ অন্যের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে ।

১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাঁটতে , দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে ।

শিখনফল অর্জনের মাধ্যমেই সার্বিকভাবে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হবে এবং শিখনফল অর্জনের জন্যই শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শিখন শেখানো কার্যক্রম (পদ্ধতি ও কৌশল এবং পরিকল্পিত কাজ)

শেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই শিখনফল অর্জনের প্রক্রিয়া চলে। শিখনফল অর্জনের জন্য বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম নির্ধারন করা হয়েছে। শিখন-শেখনো কার্যক্রমের মধ্যে যে পদ্ধতি ও কৌশল এবং পরিকল্পিত কাজ সন্নিবেশন করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে এবং পরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর

শিখনফল অর্জিত হয়। যেমন: ১.১.১ অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে । এই শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে 'নির্দেশনা ও বাস্তব প্রদর্শন অনুসরণপূর্বক হাত, পা, ঘাড়, কোমর ব্যবহার করে ব্যায়াম করা' যা প্রদর্শন ও অনুশীলন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিতে উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে ।

প্রাক-প্রাথমিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশলের উল্লেখ রয়েছে-

প্রাসঙ্গিক বা বিষয়ভিত্তিক খেলা	অভিজ্ঞতার বর্ণনা
শারীরিক অনুশীলন	হাতে-কলমে কাজ
ছবি আঁকা	পরিদর্শন
রোল প্লে (ভূমিকাভিনয়)	পর্যবেক্ষণ
ছড়া, গান, গল্প	শ্রেণিকরণ, পৃথকীকরণ, মিলকরণ
ছবি বর্ণনা বা ছবির গল্প পড়া	প্রদর্শন
অভিনয় (পরিস্থিতি তৈরি করে, রিহার্সেল, মূকাভিনয়)	স্বাস্থ্য পরিচর্যা
কথোপকথন	পরিবারকে সম্পৃক্ত করা
কণ্ঠ অনুশীলন	ছবি নিয়ে আলোচনা
	প্রাত্যহিক কাজের অনুশীলন

মূল্যায়ন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ ও ৫+ বয়সি অংশগ্রহণকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে কোন আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন না করে বিভিন্ন কাজ ও খেলায় শিশু কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে তা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিখন অগ্রগতি যাচাই বা মূল্যায়ন করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধারাবহিকভাবে শিশুর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা নিরুপণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এবং কোনো বিষয়ে শিশুর অসুবিধা থাকলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে শিখনফলের আলোকে যে শিখন শেখানো কার্যক্রম রয়েছে সেক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে হবে তারও পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন: 'নির্দেশনা ও বাস্তব প্রদর্শন অনুসরণপূর্বক হাত, পা, ঘাড়, কোমর ব্যবহার করে ব্যায়াম করা'- এই পরিকল্পিত কাজটি চেকলিস্ট ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নে নির্দেশনা রয়েছে। বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

প্রাক-প্রাথমিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে শিখনক্ষেত্র থেকে শুরু করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন এবং শিখন সামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে। "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫)" বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে ৯টি শিখন ক্ষেত্রের প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রকে একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভেঙে একাধিক শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফলের বিপরীতে শিখন শেখানো কার্যক্রম (কৌশল এবং পরিকল্পিত কাজ) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফল ও শিখন শেখানো কৌশলের বিপরীতে মূল্যায়ন এবং শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি শিখন ক্ষেত্রকে কীভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য কীভাবে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে, আবার ঐ শিখনফলের আলোকে যেসব শিখন শেখানো কার্যক্রম নির্ধারিত এবং এদের মধ্যকার সম্পর্ক তা বিস্তৃত শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

"প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫)"

৫+ বয়সিদের জন্য

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন শেখানো কার্যক্রম		মূল্যায়ন নির্দেশনা		শিখন শেখানো সামগ্রী
			পদ্ধতি ও কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস	
১. শারীরিক ও পেশিজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারা।	১.১.১ অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	নির্দেশনা ও বাস্তব প্রদর্শন অনুসরণপূর্বক হাত, পা, ঘাড়, কোমর ব্যবহার করে ব্যায়াম করা।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা, ছবি/ চিত্র/ ভিডিও
		১.১.২ অন্যের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে অনশগ্রহণ করতে পারবে।	ভূমিকাভিনয় অনুশীলন খেলা	দৈনন্দিন কাজরে ভূমিকাভিনয়। বাস্তব অনুশীলন (যেমন: হাঁটা, দৌড়ানো, খেলনা, বইপত্র ও কাপড় গুছিয়ে রাখা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে জনিসিপত্র সরানো ইত্যাদি)।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা, ছবি/ চিত্র/ ভিডিও

		১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে , দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে ।	প্রদর্শন অনুশীলন	শ্রেণিকক্ষ ও বাইরের খেলা (যেমন: হাঁটাচলা, দৌড়ানো, রশির ওপর দাঁড়িয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, গতি নিয়ন্ত্রণ করে বলে লাথি মারা , ধরা -ছোঁয়া, উঁচু-নিচুতে ওঠা-নামা , দুই-চাকার সাইকেল চালনা, পা বদল করে /এক পায়ে ভর করে কাজ/খেলা) অনুশীলন।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা, খেলাধুলার বিভিন্ন উপকরণ, ছবি/ চিত্র/ ভিডিও
	১.২ সূক্ষ্মপেশীর ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা ।	১.২.১ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো এবং নির্দেশনা অনুসরণ করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	ইচ্ছেমতো আঁকিবুঁকি ও রং করার কাজ অনুশীলন।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা, ছবি আঁকার উপকরণ (যেমন: পেন্সিল, রং-পেন্সিল, চক, ক্রেয়ন, তুলি ইত্যাদি)।

শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স বিস্তারিত জানার জন্য ‘প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫)’ এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

পরিশেষে একজন শিক্ষকের জন্য শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষাক্রমকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বলা যাবে না বরং তা আবশ্যক। এটি শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কার্যকর ও গতিশীল করার একটি পরিকল্পিত নকশা। শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব আরও অধিক বলা যায়। কেননা শিক্ষার্থীর চাহিদার আলোকে বিষয়বস্তুর অগ্রাধিকার সনাক্তকরণ, সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার্থীদের মেধা, বয়স, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজের মাত্রা নিরূপণ, সহজ থেকে কঠিন বিষয়বস্তু বিন্যাসকরণ, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উলম্ব এবং আনুভূমিক সমন্বয় সাধন, শিক্ষকের জন্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি-কৌশল, উপকরণের ব্যবহার ও

মূল্যায়নের নির্দেশনাও শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং একজন শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম জানা এবং বোঝা অপরিহার্য।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. আলী, মোঃ রজব ও অন্যান্য (২০০২), বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: নীতি, কৌশল ও সংগঠন (সিইনএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

২. এহসান, ড. মো: আবুল (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী।

৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০০৮), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত-২০২৫), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৬. মেহেরুননেছা, মিসেস ও অন্যান্য (২০১৫), পেশাগত শিক্ষা-প্রথম খন্ড (ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

৭. সাবিনা, কাওছার ও অন্যান্য (২০১৮), প্রাথমিক শিক্ষা (বিএড প্রোগ্রামের জন্য), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যায় ৩
শিখন শেখানো সামগ্রী

শিক্ষার্থীর কাছে শিখনের বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও মূর্তভাবে উপস্থাপন করতে পারলে তারা সহজে যেমন বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করতে পারে, একই সাথে স্থায়ী শিখন সম্ভব হয়। শিখন সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার শিক্ষকের প্রস্তুতি, সঠিক পাঠদান পদ্ধতি কৌশল নির্বাচন সর্বপরি শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে শিখনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। পর্যাপ্ত শিখন শেখানো সামগ্রীর অভাব থাকলে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে। শিখন শেখানো সামগ্রীর গুরুত্ব বিবেচনা করে অনেক শিখনসামগ্রী সরকারি উদ্যোগেই বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কার্যকর শিখন শেখানো কার্যক্রম নিশ্চিত করতে শিখন শেখানো সামগ্রী সম্পর্কে ধারণ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে শিখন শেখানো সামগ্রীর ধারণা, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরণের শিখন সামগ্রী এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখন সামগ্রী

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল ও সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষর্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান, ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করান। শিক্ষক অতি সাধারণভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ব্যবস্থা করলেও কিছু সাধারণ উপাদানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের পাঠদান পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সকল সাধারণ উপাদান বা সামগ্রী অপরিহার্য। এগুলোকেই শিখনসামগ্রী বলা হয়। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের জন্য শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পাশাপাশি সহায়ক যে সব অপরিহার্য উপাদান বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয় এগুলোকেই শিখন সামগ্রী বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব উপাদান বা রিসোর্স একজন শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শিখতে বা তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে যা শিক্ষার্থীর শেখার কাজে সরাসরি ব্যবহার হয় সেগুলোকে শিখন সামগ্রী বলা হয়। যেমন শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এগুলো শিখন শেখানো কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার আবশ্যিক সামগ্রী।

শিখন সামগ্রীর গুরুত্ব

শিখন সামগ্রী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনকে ত্বরান্বিত ও অর্থবহ করে তুলতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞান অনেক সময় শিক্ষার্থীর কাছে বিমূর্ত থেকে যায়; কিন্তু শিখন সামগ্রী (পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা) ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থী শেখার প্রক্রিয়ায় আরও সক্রিয়, আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, আর সেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণধারাকে কার্যকর করতে শ্রেণিকক্ষে যথাযথ শিখন সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমানে শিখন সামগ্রী রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত শিখনফল, শিক্ষার্থীর পারগতার স্তর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের শেখাকে সহজ, প্রাণবন্ত ও বাস্তবমুখী করে তোলে। নিচে শিখন সামগ্রী ব্যবহারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ

শিখন সামগ্রী ব্যবহারের ফলে শুধু শুনে শেখার চেয়ে হাতে কলমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেরাই পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনে অংশ নিতে পারে। যেমন প্রাথমিক স্তরের ৪র্থ শ্রেণির বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের প্রায় প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটাতে অত্যান্ত সহায়ক। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বর্তমান প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক একাধিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

২. বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করা

গণিত, বিজ্ঞান বা ভাষার অনেক বিষয় বিমূর্ত থাকায় কল্পনা করে বোঝা কঠিন। শিখন সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার সেই বিমূর্ত ধারণাকে দৃশ্যমান, স্পর্শযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য করে। শিক্ষক সহায়িকায় পাঠের বিষয়বস্তুকে কীভাবে আরো দৃশ্যমান, স্পর্শযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া আছে। যেমন ৩য় শ্রেণির বাংলা শিক্ষক সহায়িকায় 'আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী' পাঠে পরস্পরের পরিচয়ের বিষয়টি ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরার নির্দেশনা দেওয়া আছে। এভাবে বিষয়টিকে দৃশ্যমান করে তুলে ধরলে শিশুরা সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবে এবং শিখনফল অর্জন সহজ হবে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

৩. শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখে ও শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করে

রঙিন ও আকর্ষণীয় সামগ্রী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখতে সাহায্য করে এবং পাঠে আগ্রহ বাড়ায়। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েই প্রাথমিকের বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, উন্নত কাগজ ও রঙ্গীন ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. স্বতঃস্ফূর্ততা, শিখনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ

বিভিন্ন শ্রেণির জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকায় শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন, আবেগসৃষ্টি, সঠিক পদ্ধতি কৌশল নির্বাচনের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া আছে। যা সঠিক ভাবে অনুসরণে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখনে অংশগ্রহণ করে এবং শিখনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, একই সাথে শিক্ষার্থীরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন ধারণা তৈরিসহ শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

৫. কার্যকর মূল্যায়নকে সহজ করে

শিখন সামগ্রীর নির্দেশনার সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা, ধারণা ও প্রয়োগক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যা বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়নকে সহায়তা করে।

সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো কার্যাবলীকে সার্থক, ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিখন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বিভিন্ন প্রকার শিখন সামগ্রী

শিক্ষার স্তর, শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিখন সামগ্রী বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

প্রাক প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিখন সামগ্রীসমূহ

- **শিক্ষক সাহায়িকা:** প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রণীত অন্যতম শিখন সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের) শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত আছে।
- **গল্পের বই:** প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুদের অন্যতম শিখন সামগ্রী হলো ৪+ বয়সি শিশুদের উপযোগী ১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট। এর মধ্যে ৫টি ছবির গল্প অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। এ ছাড়াও ৫টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করেন।

- **এসো আঁকিবুকি করি:** এটি প্রাক-প্রাথমিক ৪+ বয়সি শিশুদের একটি অনুশীলন খাতা। 'এসো আঁকিবুকি করি' অনুশীলন খাতা শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি করে "এসো আঁকিবুকি করি" অনুশীলন খাতা সরকারিভাবে সরবরাহ করার নির্দেশনা রয়েছে।
- **ফ্লিপচার্ট:** ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ফ্লিপচার্ট সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্লিপ চার্টে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
- **ফ্লাস কার্ড:** ৪+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২ সেট ফ্লাস কার্ড (প্রতি সেটে ৩৯টি করে কার্ড) প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত বিভিন্ন কাজের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাসকার্ড ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এছাড়াও প্রাক প্রাথমিক স্তরের (৪+ বয়সি) শিক্ষার্থীদের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য উপকরণ ও সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন: খেলার সামগ্রী ও উপকরণ, কাঁচি, পেন্সিল ও রঙ পেন্সিলসহ অন্যান্য উপকরণ, শিশুর শিখন আগ্রগতি পরিমাপের ছক ও হাজিরা ছক ইত্যাদি।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিখন সামগ্রীসমূহ

- **শিক্ষক সহায়িকা:** ৪+ বয়সী প্রাক প্রাথমিক স্তরের মত ৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্যও শিক্ষার মূল শিখন শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত আছে। শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।
- **আমার বই:** 'আমার বই' মূলত শিশুদের জন্য একটি ওয়ার্কবুক। প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে 'আমার বই' প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুরা 'আমার বই'তে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং অনুশীলন করে। 'আমার বই'য়ের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে করাতে হয়।
- **গল্পের বই:** প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের উপযোগী ১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট 'গল্পের বই' নামে শিখন সহায়ক সামগ্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১২টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষককে গল্প বলার কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। উল্লেখ্য, ৪+ বয়সী শিশুদের জন্য ৫টি ছবির গল্প থাকলেও ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য ছবির গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া ৪+ বয়সী শিশুদের জন্য ৫টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় থাকলেও ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য ১২টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে।
- **এসো লিখতে শিখি- অনুশীলন খাতা:** 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা শিশুদের লেখার অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে অনুশীলন খাতা বিদ্যালয়ভিত্তিক সরবরাহ করা হয় । এটি ব্যবহারের নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষার কাজের জন্যও এই অনুশীলন খাতাটি ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, ৪+ শিশুদের জন্য "এসো আঁকিবুকি করি" অনুশীলন খাতা থাকলেও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৫+ শিশুদের জন্য 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **স্বরবর্ণ চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট এবং সংখ্যা চার্ট (১-২০):** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্টে ছড়ায় ছন্দে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে ঝুলানো থাকবে। এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা আছে। এছাড়াও সংখ্যার চার্ট (১-২০) প্রণয়ন করা হয়েছে যা শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে করাতে হবে। ৪+ বয়সী শিশুদের জন্য এই উপকরণটি অন্তর্ভুক্ত নেই।

- **ফ্লিপচার্ট :** ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হয়। ফ্লিপ চার্টে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয়গুলো শেখানোর জন্য ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৫+ এর শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করেন ।
- **ফ্লাস কার্ড:** ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে ৩ সেট (প্রতি সেটে মোট ৭১টি) করে ফ্লাস কার্ড সরবরাহ করা হয়ে থাকে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে ৫০টি বর্ণ কার্ড এবং ০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ২১টি সংখ্যা কার্ড প্রতি সেট ফ্লাস কার্ডে রয়েছে। বর্ণ ও সংখ্যা কার্ডের পিছনে বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত রয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করেন । ৪+ বয়সী শিশুদের চাইতে ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য সরবরাহকৃত ফ্লিপ চার্টের সংখ্যা অনেক বেশী।

এছাড়াও প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক ৫+ শ্রেণিতে ৪টি করে ভুবন (কর্নার) থাকে। ভুবন (কর্নার) ৪টি হলো- কল্পনার ভুবন (কর্নার), ব্লক ও নাড়াচড়ার কর্নার, বই ও আঁকার ভুবন (কর্নার) এবং বালি ও পানির কর্নার। প্রতিটি কর্নার পর্যপ্ত উপকরণ দিয়ে সজ্জিত থাকে। এছাড়া প্রাক প্রাথমিক স্তরের (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীদের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য উপকরণ ও সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন: খেলার সামগ্রী ও উপকরণ, কাঁচি, পেন্সিল ও রঙ পেন্সিলসহ অন্যান্য উপকরণ, শিশুর শিখন আগ্রগতি পরিমাপের ছক ও হাজিরা ছক ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও অন্যান্য স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু শিখন শেখানো সামগ্রী

পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যপুস্তক হলো সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিখন সামগ্রী। যে কোনো শিক্ষাক্রমের অন্যতম প্রধান শিখন শেখানো সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক। জ্ঞান চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এটি। পাঠ্যপুস্তক মানবজাতির চিন্তাধারার বিবরণ এবং এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষণে সহায়তা করা (A text book is a record of racial Winking organised for instructional purpose)। পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিকক্ষে বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রকৃত বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে। আজকাল বিষয়বস্তুকে আরও মূর্ত করে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বহু ছবি, মানচিত্র, লেখচিত্র ইত্যাদিও ছাপা হয়। সাধারণত শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, যোগ্যতা, আগ্রহ প্রবণতা এবং চাহিদাভিত্তিক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি মোতাবেক রচিত সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর নির্ভুল উপস্থাপন সমেত রচিত পূর্ণাঙ্গ পুস্তককেই পাঠ্যপুস্তক বা Textbook বলে। যেমন-৫ম শ্রেণির সাধারণ বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি যা NCTB প্রণীত। বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক National Curriculum and Textbook Board (NCTB) প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে থাকে।

একটি পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল। যথা-

১. শিক্ষাক্রমের সাথে পাঠ্যপুস্তকের সামঞ্জস্য থাকে;

২. পাঠ্যপুস্তক হবে জাতীয় ঐতিহ্য এবং কৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

৩. পাঠ্যপুস্তকে সর্বাধুনিক তথ্য, তত্ত্ব এবং বিষয়াবলির নির্ভুল উপস্থাপনা থাকে;

৪. প্রতি অধ্যায়ের শেষে নির্বাচিত প্রশ্নগুচ্ছ ও নানাবিধ কর্মভিত্তিক অনুশীলনী, সার-সংক্ষেপ, পরিভাষা ও প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকে;

৫. কোন তত্ত্ব বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে একাধিক উদাহরণ থাকা আবশ্যক। উদাহরণ প্রয়োগে বাস্তবতার দিকে নজর দেওয়া হয়;

৬. পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপযোগী হতে হবে। বিষয়বস্তু মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করতে হবে যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ হয়;

৭. পাঠ্যপুস্তকে সহজ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে বিষয়বস্তুর বর্ণনা থাকবে যেন শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ধরে রাখতে পারে;

৮. পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয় স্থানে পর্যাপ্ত চার্ট, মানচিত্র, ডায়াগ্রাম ও ছবি থাকবে;

পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যেসমূহ একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে পাঠ্যপুস্তকে যতবেশী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, সেই পাঠ্যপুস্তক ততবেশী মানসম্মত।

মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

১. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য স্পষ্ট দিকনির্দেশনা

একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষক সহজে পাঠের বিষয়বস্তু পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ধাপে ধাপে বিষয়গুলো শিখতে পারে।

২. নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তি

মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকে হালনাগাদ ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। যা শিক্ষার্থীকে সমসাময়িক জ্ঞানের অধিকারী করে তোলে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনে এটি একটি গ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৩. **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সংস্কৃতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গিগঠন**

একটি মানসম্মত বই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করে বিষয়বস্তু তুলে ধরে, যাতে শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বৈষম্য ভুলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে।

৪. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক যুগ যুগ ধরে একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। সময় পরিক্রমায় জীবন ধারার পরিবর্তনে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চায় পরিবর্তন আসে। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গল্প, ছড়া কবিতা যুগের পর যুগ দেশীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্য লালন করে এবং সংরক্ষণ করে।

৫. **স্ব-শিক্ষায় সহায়ক**

যেহতু পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছেই থাকে।তাই বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি বাড়িতে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন গল্প ও কবিতা আয়ত্ব করে থাকে। যা তাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমন তাদেরকে সাবলীল পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করে।

৬. **সৃজনশীল চিন্তার ভিত্তি**

একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তকে শুধু তথ্য ও তত্ত্ব থাকে না বরং এখানে শিক্ষার্থীদের পারদর্শীতা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। যা শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তনে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ সাধন করে।

তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অবদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে উত্তম পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষক সহায়িকা

সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিচালনাকে সহজতর করা জন্য কতিপয় দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ সমেত যে পুস্তিকা NCTB প্রেরণ করে থাকে তাকেই শিক্ষক সহায়িকা Teacher's Guide বলা হয়। এটি কেবল শিক্ষকের জন্যই প্রণীত এবং প্রেরিত হয়।

শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য

১. পাঠ্যপুস্তকের একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ থেকে শিক্ষাক্রমের কোন শিখনফলটি বা যোগ্যতাটি অর্জন করা সম্ভব তা শিক্ষক সহায়িকায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকে।

২. শিক্ষক সহায়িকা পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলামের মধ্য যোগসূত্র স্থাপন করে থাকে। অর্থৎ কারিকুলামে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ,শিখনফল, পাঠদান ও মূল্যায়ন কৌশল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে কীভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ থাকে।

৩. বিষয়বস্তুর পরিধির উপর ভিত্তি করে একটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তকে কয়টি পিরিয়ড বা পাঠে ভাগ যায় তার সঠিক বিভাজন শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ থাকে।

৪. শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার জন্য কীভাবে আবেগ সৃষ্ট করতে হবে, কীভাবে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় থাকে।

৫. শিক্ষার্থীদের চাহিদা, ধরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর শিখন দক্ষতাকে বিবেচনায় নিয়ে কী ধরনের শ্রেণি পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৬. শিক্ষার্থীদের মূল্যয়নের কৌশল কী হবে? পুরো অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের ভূমিক কী হবে এবং শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ থাকে।

শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব

- শিক্ষকদের পাঠদান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক শিখন সামগ্রী হিসেবে শিক্ষক সহায়িকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত। মূলত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন করাতে শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব আপরিসীম।
- শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অধ্যায়ভুক্ত প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য, শিখনফল, পদ্ধতি/কৌশল, সংশ্লিষ্ট উপকরণ এবং মূল্যায়ন কৌশলসহ একটি পাঠ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া থাকে। যা শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষক সহায়িকায় পাঠদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা থাকে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিক্ষণের উপযোগী করে উপস্থাপন করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকে। যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষক সহায়িকায় পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও তার ব্যবহারবিধি উল্লেখ থাকে। মূল্যায়ন ও পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে প্রশ্ন করার কৌশল, প্রশ্ন তৈরির নিয়মাবলি এবং প্রশ্নের উত্তরসহ শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত তথ্যও পরিবেশন করা হয়। যা শিক্ষার্থীদের পারদর্শীতা মূল্যায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর উপলব্ধি ক্ষমতা সমান নয়। তাই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিরাময়মূলক পাঠদান পদ্ধতি এতে আলোচনা করা হয়। যা শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব অপরসীম।

সুতরাং বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠ উপস্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষকের প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য রেফারেন্স পুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব এবং ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাক্রম

ইতপূর্বে আমরা শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছি। একটি দেশের কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা হলো শিক্ষাক্রম, যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু নির্বাচন, সংগঠন ও মূল্যায়নসহ শিক্ষার যাবতীয় উপাদানসমূহ এবং এই সকল উপাদানসমূহের সঠিক ব্যবহার প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষাক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, ইচ্ছা, আগ্রহ ও সক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যাশিত শিখন অর্জনগুলি নির্বাচনে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বিষয় বিন্যাসে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক নীতি।

পরিবর্তনশীল ও নমনীয়

সময়ের চাহিদা ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রমও পরিবর্তিত হয়। শিক্ষাক্রমের এই পরিবর্তন শিক্ষার্থীকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আধুনিক জ্ঞানের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে প্রস্তুত করে তোলে।

জাতীয় শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন

শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষনীতি ও শিক্ষা কমিশনের প্রতিফলন থাকে। দেশের জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

দেশের নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, পাঠদান পদ্ধতি কৌশল কী হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব

১. শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম হল কোন একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের বিশদ পূর্ব পরিকল্পনা। এর মধ্যে কোন একটি দেশ কিংবা জাতির স্তরভিত্তিক অথবা সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কাজেই জাতীয়ভাবেই শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২. শিক্ষা কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কোন একটি দেশ কিংবা জাতির সামগ্রিক শিক্ষা কর্মতৎপরতা ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা কি শিখবে, কিভাবে শিখবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও চাহিদা কি হবে ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই শিক্ষার বিভিন্ন কর্মকান্ডের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৩. **শিখন সামগ্রী নির্ধারণ**

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিখন সামগ্রী কী হবে, শিক্ষার সাথে তার সম্পৃক্ততা কতটুকু তা শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত থাকে। ফলে উপযুক্ত শিখনসামগ্রী নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে শিক্ষাক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **জাতীয় চাহিদা, প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাধারা প্রবর্তন**

শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে জাতীয় চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করা হয়ে থাকে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার দিক নির্দেশনাও শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দক্ষ হওয়ার সুযোগ পায়। তাই জাতির দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৫. **পাঠ্যসূচি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ**

শিক্ষাক্রমের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান রক্ষা করে বিষয়বস্তু ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা। শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার স্তরভিত্তিক বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে শিক্ষাক্রম। কাজেই যথার্থ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৬. **শিখন অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন**

শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা তার বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। জাতীয় চাহিদার আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও যথার্থ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রণয়নে শিক্ষাক্রমের বিকল্প নেই।

৭. **রাষ্ট্রীয় জীবন দর্শনের রূপায়ণ**

শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্র আদর্শ এবং নাগরিক জীবন দর্শনের পরিপূর্ণ রূপায়ণ হয়ে থাকে। কারণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং নাগরিক জীবন দর্শনকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় জীবন দর্শনের রূপায়ণে শিক্ষাক্রমের ভূমিকা রয়েছে।

৮. **জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন**

জাতীয় উন্নয়নের নিমিত্তে পরিপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়নে জাতীয়ভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। আর এ শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। যাতে শিক্ষার উন্নয়নের যাবতীয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। কাজেই জাতীয়ভাবে শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৯. **শিখন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন**

শিক্ষার্থী কি শিখতে পারল, তাদের শিখন অভিজ্ঞতা কতটুকু, শিক্ষণের কার্য পারদর্শিতা কতটুকু ইত্যাদি মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষাক্রম বিশেষভাবে তাগিদ দেয়। কাজেই শিখন অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের দিক নির্দেশনার জন্যও শিক্ষাক্রমের ভূমিকা রয়েছে।

১০. **শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন**

বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেসব শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, তার সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন হয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমেই। কাজেই জাতীয়ভাবে শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাক্রমের বিকল্প নেই।

১১. **শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার উন্নয়ন**

শিক্ষাক্রমে স্তরভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিভাবে শিখন শেখানো দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায় তার যথার্থ উদ্যোগ শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গ্রহণ করা হয়। কাজেই স্তরভিত্তিক শিখন শেখানো দক্ষতার কাঙ্খিত উন্নয়নে শিক্ষাক্রমের বিকল্প নেই।

বিভিন্ন শিখন সামগ্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক

শিক্ষাক্রম একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে শিখনক্ষেত্র ,বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যাত, শিখনফল প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এই সকল যোগ্যতা ও শিখনফল সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে অর্জন করে থাকে। এই সকল বিষয়বস্তুসমূহের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় বিষয়ভিত্তিক পাঠপুস্তক। আর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য ,শিখনফল, পদ্ধতি- কৌশল ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে ।

শিখন সামগ্রীগুলোর মধ্যে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী। নিম্নে এগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও কার্যকর উপস্থাপন

শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও শিখনফল অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকে। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। এখানে তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা ও উদাহরণ থাকে কিন্তু কীভাবে পড়াতে হবে, কীভাবে আবেগ সৃষ্টি করতে হবে, মূল্যায়ন কীভাবে হবে, সময় ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে তা পাঠ্যপুস্তকে থাকে না। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব, শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণ প্রদান করে, পাঠ্যপুস্তক বিষয়বস্তুর ভিত্তি তৈরি করে এবং শিক্ষক সহায়িকা তা শিক্ষণযোগ্য রূপে সাজাতে সহায়তা করে।

শিক্ষাক্রমে পাঠদানের পদ্ধতি-কৌশল কি হতে পারে তা বলা থাকে। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের নির্দেশনাও থাকে। কিন্তু উক্ত কাজের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এসব বিষয় শিক্ষক সহায়িকায় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত থাকে।

পাঠ পরিকল্পনা তৈরি

কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা তৈরির জন্য শিক্ষককে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা উভয়ই অনুসরণ করতে হয়। আর পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষাক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে তৈরি করা হয়।

বিভিন্ন জটিল বিষয় সহজে শেখা

বিমূর্ত বা কঠিন ধারণাযুক্ত বিষয়বস্তু যেমন গণিতের সমস্যা, ব্যাকরণ, বিজ্ঞানের ধারণা ইত্যাদি কঠিন বিষয়সমূহের শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে শিক্ষাক্রমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধারণা দেওয়া থাকলেও শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া ধাপ, উপমা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এসকল বিষয় সহজে শেখানো যায়। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে বোধগম্য করতে শিক্ষক সহায়িকা অপরিহার্য।

মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার সঠিক বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা যায় সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের ধরন এবং পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশন থাকলেও কীভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশনা থাকে না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কীভাবে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করে শিখন আগ্রগটি পরিমাপ করা যায় তা শিক্ষক সহায়িকায় সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত থাকে। সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পরস্পর ওতপ্রতভাবে সম্পর্কিত। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো।

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম (৩য় শ্রেণি, বিজ্ঞান)

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

বিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কার্যাবলি		মূল্যায়ন নির্দেশনা	
				পদ্ধতি/কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীবের গঠন, জীবনচক্র, প্রজনন, জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশে জীবের ভূমিকা ও টিকে থাকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা এবং অর্জিত জ্ঞান মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।	১.১ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন ও বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের কাজ উপলব্ধি করে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	১.১.১ একটি পরিচিত উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কন করতে পারবে।	উদ্ভিদ পরিচিতি	একক কাজ দলগত কাজ মার্কেট প্লেস এক্টিভিটি অংকন	অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কন করা।	পর্যবেক্ষণ মৌখিক লিখিত	চেকলিস্ট প্রশ্নমালা লেভেলবিহীন চিত্র
		১.১.২ উদ্ভিদদেহের সাধারণ অংশ– মূল, কান্ড ও পাতা শনাক্ত করতে পারবে।	উদ্ভিদ বিভিন্ন বাহ্যিক অংশের কাজ, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব	একক কাজ দলগত কাজ উপস্থাপন আলোচনা প্রদর্শন ভূমিকাভিনয়	বাস্তব উপকরণ/ "আমি একটি গাছ" ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা।	পর্যবেক্ষণ মৌখিক লিখিত	চেকলিস্ট প্রশ্নমালা লেভেলবিহীন চিত্র

প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সকল অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করবে বলে ধারণ করা হচ্ছে তা বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে লেখা হয়েছে। এসকল যোগ্যতার মধ্য হতে ৩য় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে তা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে লেখা হয়েছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার্থী কী শিখনফল অর্জন করবে, এই শিখনফল অর্জন করাতে কী কী বিষয়বস্তুর প্রয়োজন হবে, কোন পদ্ধত ও কৌশল ব্যবহার করে এই সকল বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা ধারাবাহিক ভাবে বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ৩য় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন ও বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের কাজ উপলব্ধি করে এই সকল কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সংগতি রেখে প্রত্যাশিত শিখনফল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে পরিচিত উদ্ভিদের ছবি আঁকতে পারা এবং উদ্ভিদদেহের সাধারণ অংশ-মূল, কান্ড ও পাতা শনাক্ত করতে পারা। উক্ত শিখনফল অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু হিসেবে 'উদ্ভিদ পরিচিতি এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের বাহ্যিক অংশের কাজ, প্রয়োজনীয়তা ও গরুত্ব' শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে উক্ত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে একক কাজ, দলীয় কাজ, মার্কেট প্লেস, অংকন, আলোচনা,প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয়সহ অন্যান্য পদ্ধতি কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পিত কাজ হিসেবে রাখা হয়েছে 'উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কন ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা'। মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং লিখিত ও মৌখিক প্রশ্ন করার কথা শিক্ষাক্রমে বলা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়েই পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা রচনা করা হয়েছে। নিম্নে শিক্ষাক্রমের সাথে সংগতি রেখে তৃতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুসমূহ কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা আলোচনা করা হলো:

পাঠ্যপুস্তক (৩য় শ্রেণি, বিজ্ঞান)

অধ্যায় ১

উদ্ভিদ পরিচিতি

পৃথিবীতে নানা রকমের জীব আছে। উদ্ভিদ এক ধরনের জীব। আমরা আমাদের আশপাশে নানা ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাই। যেমন: আম, জাম, লেবু, পেয়ারা, গোলাপ, মরিচ, সরিষা গাছ প্রভৃতি। এগুলোর আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদিতে ভিন্নতা রয়েছে।

১. উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের হলেও এগুলোর গঠনে কিছু মিল রয়েছে।

উদ্ভিদের সাধারণ অংশগুলো কী কী?

কাজ : উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে :

১. শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে কিছু পরিচিত উদ্ভিদ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২. নিজের খাতায় একটি পরিচিত উদ্ভিদের ছবি আঁকি।

৩. ছবিতে গাছের প্রতিটি অংশের নাম লিখি ।

৪. নিজের আঁকা ছবিটি সহপাঠীদের আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করি ।

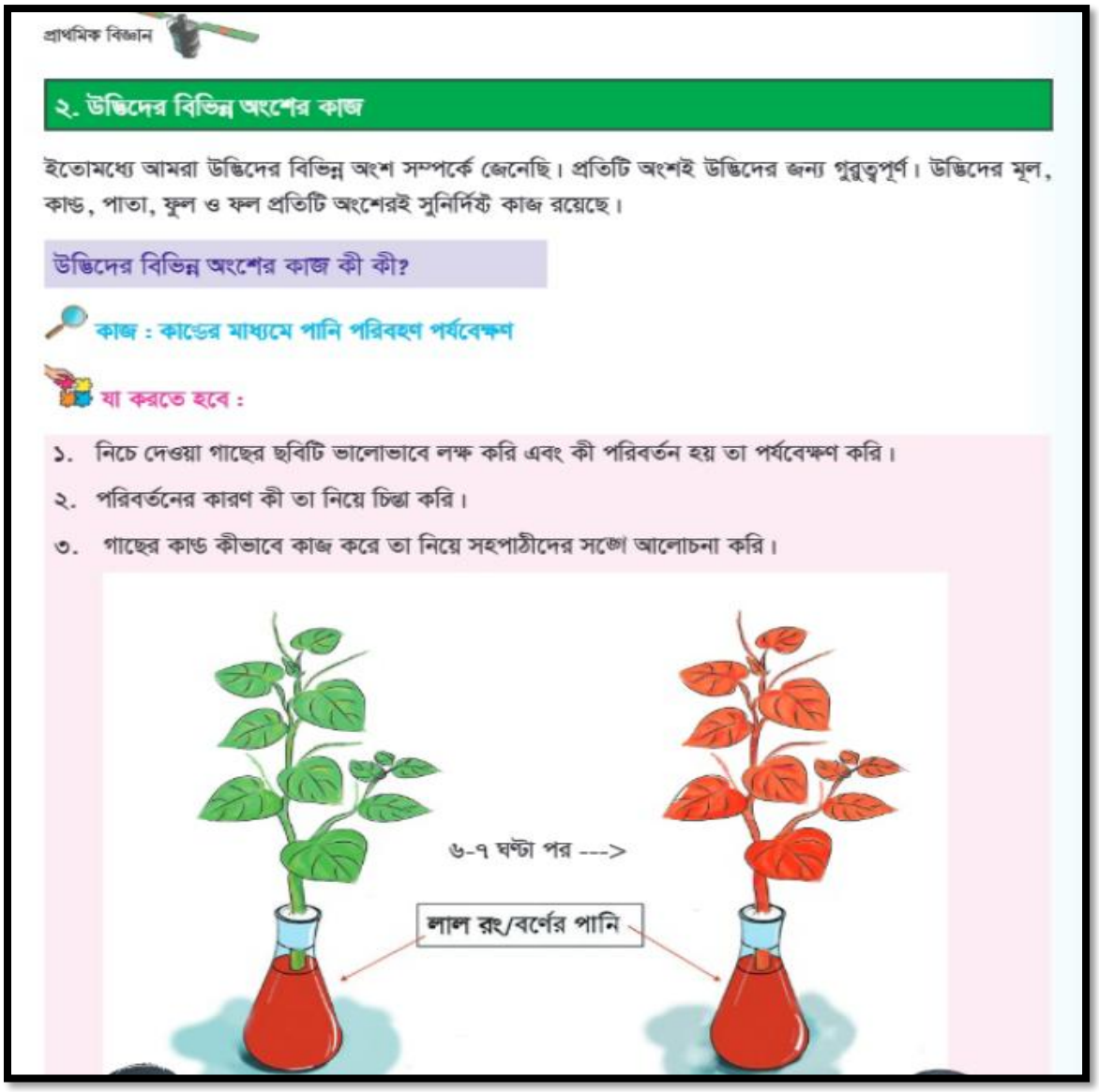

প্রাথমিক বিজ্ঞান

২. উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ

ইতোমধ্যে আমরা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জেনেছি। প্রতিটি অংশই উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল প্রতিটি অংশেরই সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ কী কী?

কাজ : কাণ্ডের মাধ্যমে পানি পরিবহণ পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে :

১. নিচে দেওয়া গাছের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ করি এবং কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করি।

২. পরিবর্তনের কারণ কী তা নিয়ে চিন্তা করি।

৩. গাছের কাণ্ড কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

তৃতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বইতে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত ‘উদ্ভিদ পরিচিতি এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের বাহ্যিক অংশের কাজ, প্রয়োজনীয়তা ও গরুত্ব’ প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ‘উদ্ভিদ পরিচিতি’ শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে ১ নং শিরোনামে ‘উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ’ এবং ২ নং শিরোনামে ‘উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ’ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে করনীয় সংক্রান্ত কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে এসকল কর্মকান্ড কীভাবে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব তার বিস্তারিত নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তৃতীয় শ্রেণির বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ও বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতি রেখে কীভাবে শিক্ষক সহায়িকায় বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে তা আলোচনা করা হলো।

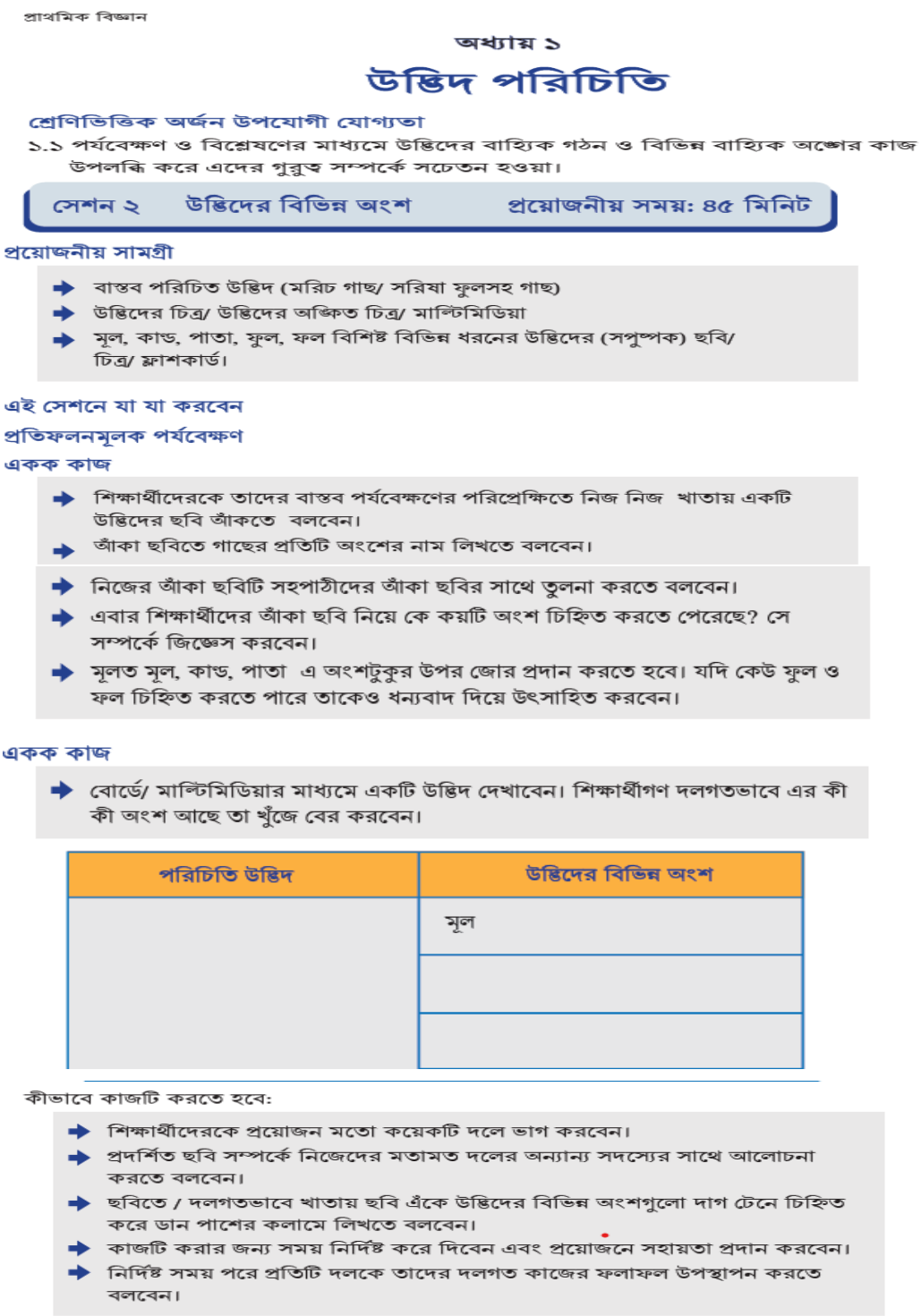

প্রাথমিক বিজ্ঞান

অধ্যায় ১

উদ্ভিদ পরিচিতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন ও বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের কাজ উপলব্ধি করে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

সেশন ২ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ প্রয়োজনীয় সময়: ৪৫ মিনিট

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

- বাস্তব পরিচিত উদ্ভিদ (মরিচ গাছ/ সরিষা ফুলসহ গাছ)
- উদ্ভিদের চিত্র/ উদ্ভিদের অঙ্কিত চিত্র/ মাল্টিমিডিয়া
- মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল বিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের (সপুষ্পক) ছবি/ চিত্র/ ফ্লাশকার্ড।

এই সেশনে যা যা করবেন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

একক কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ খাতায় একটি উদ্ভিদের ছবি আঁকতে বলবেন।
- আঁকা ছবিতে গাছের প্রতিটি অংশের নাম লিখতে বলবেন।
- নিজের আঁকা ছবিটি সহপাঠীদের আঁকা ছবির সাথে তুলনা করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি নিয়ে কে কয়টি অংশ চিহ্নিত করতে পেরেছে? সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।
- মূলত মূল, কান্ড, পাতা এ অংশটুকুর উপর জোর প্রদান করতে হবে। যদি কেউ ফুল ও ফল চিহ্নিত করতে পারে তাকেও ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

একক কাজ

- বোর্ডে/ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে একটি উদ্ভিদ দেখাবেন। শিক্ষার্থীগণ দলগতভাবে এর কী কী অংশ আছে তা খুঁজে বের করবেন।

পরিচিতি উদ্ভিদ	উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ
	মূল

কীভাবে কাজটি করতে হবে:

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজন মতো কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করতে বলবেন।
- ছবিতে / দলগতভাবে খাতায় ছবি এঁকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলো দাগ টেনে চিহ্নিত করে ডান পাশের কলামে লিখতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক সহায়িকাতে উদ্ভিদ পরিচিতি অধ্যায়টিকে ৭টি সেশনে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২য় সেশনে 'উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি পাঠদানের জন্য উপকরণ হিসেবে বাস্তব মরিচ/সরিষা গাছ, মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল বিশিষ্ট গাছের ছবি ব্যবহরের নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় হয়েছে। শিখন শেখানো পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষক সহায়িকাতেও একক কাজ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে খাতায় পরিচিত উদ্ভিদের ছবি আঁকার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে শিক্ষক সহায়িকায়ও এককভাবে ছবি অংকনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত

প্রদর্শন পদ্ধতিতে উদ্ভিদের ছবি দেখিয়ে কীভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শণাক্ত করতে পারে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। একইভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে মিল রেখে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কৌশল কীভাবে সহজে বাস্তবায়ন করা যায় তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি শিখন সামগ্রীই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। শিখন সামগ্রীসমূহের সঠিক সমন্বয় ও ব্যবহার শ্রেণি কার্যক্রমকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিখন সামগ্রীগুলো শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। তাই শ্রেণি পাঠদান সার্থক করতে প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীগুলোর পারস্পারিক সঠিক সমন্বয় অপরিহার্য।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

1. Sharma, R. A. (2013). *Educational Technology and Learning Resources*. Meerut: R. Lal Book Depot.

২. রায়, সুশীল (২০০৫), শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ

৩. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর(২০০৮), মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, প্রভাতী লাইব্রেরী।

৪. শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ শিশুদের জন্য

৫. শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৫+ শিশুদের জন্য

অধ্যায় ৪
শিখন শেখানো উপকরণ

প্রবাদ আছে, দশ হাজার শব্দ ব্যবহার করে যা বোঝানো যায় না, একটি মাত্র ভালো ছবির সাহায্যে তা বোঝানো যায়। শুধু মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো বিষয় পুরোপুরি পরিষ্কার হয়না। মৌখিক আলোচনার পাশাপাশি কোনো ছবি, ভিডিও, মডেল বা কোনো চার্ট দেখানো হলে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়টি বুঝতে পারে ও বেশি দিন মনে থাকে। কারণ আমরা যখন কিছু শুনি তা খুব কম সময়ই আমাদের মনে থাকে কিন্তু যদি এর সাথে দেখা বা স্পর্শ করার সুযোগ হয় তবে তা দীর্ঘ সময় ধরে রাখা সম্ভব হয়। শ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের মাত্র একটি ইন্দ্রিয় ব্যবহার হয়। আমরা যখন কোনো ছবি দেখি, ভিডিও দেখি ও শুনি, কোনো মডেল স্পর্শ করি বা কোনো কিছুর ঘ্রাণ বা স্বাদ নেই তখন আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয় যেমন, চোখ, নাক, জিহ্বা, ত্বক ব্যবহার হয়। ফলে কোনো বিষয় সহজে বোঝা যায় বা দীর্ঘ সময় মনে রাখা যায়। যেমন: আমরা যদি কোনো শিশুকে গণিত বিষয়ে যোগ (৩+২=৫) বা বিয়োগ (৩-২=১) শেখাতে চাই তবে তিনটি কলম এবং দুইটি কলম একত্র করে পাঁচটি কলম বা তিনটি কাঁঠি থেকে দুইটি কাঁঠি সরিয়ে একটি কাঁঠি শেখালে শিশুর শিখন পরিপূর্ণ হবে। কারণ এখানে শিশুর দেখা, শোনা এবং স্পর্শ করার সুযোগ থাকে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করার জন্য শিখন শেখানো উপকরণ ব্যবহার করা জরুরি। আবার উপকরণ বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ না হলে বা উপযুক্ত সময়ে যথাযথ উপকরণ ব্যবহার না করলে শিখনের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। এ অধ্যায়ে শিখন শেখানো উপকরণের ধারণা, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরনের শিখন শেখানো উপকরণ, উপকরণ নির্বাচন, তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখন শেখানো উপকরণের ধারণা

উপকরণের আভিধানিক অর্থ উপাদান। এছাড়া উপকরণের বিশেষ অর্থ প্রদীপন যা বিষয়কে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। সাধারণত শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় যেসব দ্রব্য-সামগ্রী বা উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকেই শিখন শেখানো উপকরণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, শিখন শেখানো কার্যক্রমে যেসব বস্তু, দ্রব্য-সামগ্রী বা উপাদান ব্যবহার করে শিখনের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ, আকর্ষণীয়, প্রাঞ্জল, বোধগম্য, মূর্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলা যায় এবং শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা যায় সেসব দ্রব্য-সামগ্রী বা উপাদানকেই শিখন শেখানো উপকরণ বলা হয়। যেমন- চিত্র, ছবি, চার্ট, নকশা, মানচিত্র, মডেল, অডিও, ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি শিখন শেখানোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রমকে আনন্দধায়ক, ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী করার ক্ষেত্রে উপকরণের বিকল্প নেই।

শিখন শেখানো উপকরণের গুরুত্ব

উপকরণ শিখন শেখানো কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিখন শেখানো উপকরণ ব্যবহার করা হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও কার্যকরি করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। উপকরণ পাঠদানে বৈচিত্র্য আনে এবং শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমী দূর করে পাঠের প্রতি মনোযোগী করে। আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে শিখনের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজ ও বাস্তবভিত্তিক করে উপস্থাপন করা। শ্রেণিপাঠে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় রাখার জন্য এবং পাঠের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্য উপকরণ ব্যবহার করা জরুরি। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশে উপকরণের ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখে। নিচে শিখন শেখানো কার্যক্রমে উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষার্থীর প্রেষণা জাগ্রত করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপ্ত করে।

২. পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে।

৩. শিক্ষা উপকরণ বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলে।
৪. শিক্ষার্থীদের শিখন সহজ ও স্বত:স্ফূর্ত হয়।
৫. শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে।
৬. অধিক মনে রাখা নিশ্চিত করে এবং শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৭. স্বল্প সময়ে কার্যকর শিখন সম্ভব হয়।
৮. বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে।
৯. বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।
১০. উপকরণ শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি দূর করে শিখন কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে আসে ।
১১. শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে।
১২. শিক্ষার্থীগণ 'হাতে-কলমে' শেখার সুযোগ লাভ করে।
১৩. সমস্যা সমাধানের এবং সঠিকভাবে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।
১৪. সহজে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষণ সম্ভব হয়।
১৫. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়; ফলে শিখন আনন্দদায়ক হয়।
১৬. শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চার করে উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, যা তাকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।
১৭. উপকরণের ব্যবহার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রম বাঁচায় ।
১৮. উপকরণ ব্যবহারে পাঠদান আকর্ষণীয় হয় এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

শিখন- শেখানো উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। বিষয়ের ভিন্নতায় এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উপকরণের ধরণ ভিন্ন হয়। সাধারণত শিখন শেখানো উপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

শ্রবণযোগ্য উপকরণ: শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে শ্রবণভিত্তিক উপকরণ অন্যতম। যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে শিখনের বিষয়বস্তুকে শ্রবণযোগ্য করে তোলে বা আমরা আমাদের কান দিয়ে শুনতে পাই সেসব উপকরণকে শ্রবণযোগ্য উপকরণ বলা হয়। যেমন-রেডিও, টেপ রেকর্ডার, অডিও ক্যাসেট, সিডি প্লেয়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

দর্শনযোগ্য উপকরণ: শ্রেণী পাঠদানে যেসব উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল তাদের দর্শন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পঠন-পাঠনে সক্রিয় হয় সেসব উপকরণকে দর্শনযোগ্য উপকরণ বলে। যেমন-পোস্টার, ছবি, চার্ট, গ্লোব, বিভিন্ন মডেল, ম্যাপ, জার্নাল, বিভিন্ন প্রকার বোর্ড, পত্রপত্রিকা, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি। এসব উপকরণ বিষয়বস্তুকে দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে বা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই। দর্শনভিত্তিক উপকরণ শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যে কোন স্তরের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমে দর্শনভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার অপরিহার্য।

শ্রবণ-দর্শনযোগ্য উপকরণ: যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীর একই সাথে শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে বিষয়বস্তু অনুধাবনে সাহায্য করে সেসব উপকরণকে শ্রবণ-দর্শনযোগ্য উপকরণ বলা হয়। এসব উপকরণ বিষয়বস্তুকে একইসাথে শ্রবণ ও দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে অর্থাৎ আমাদের চোখ ও কানের ব্যবহার করে আমি বুঝতে পারি। যেমন-টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ডিভিডি, মনিটর, মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

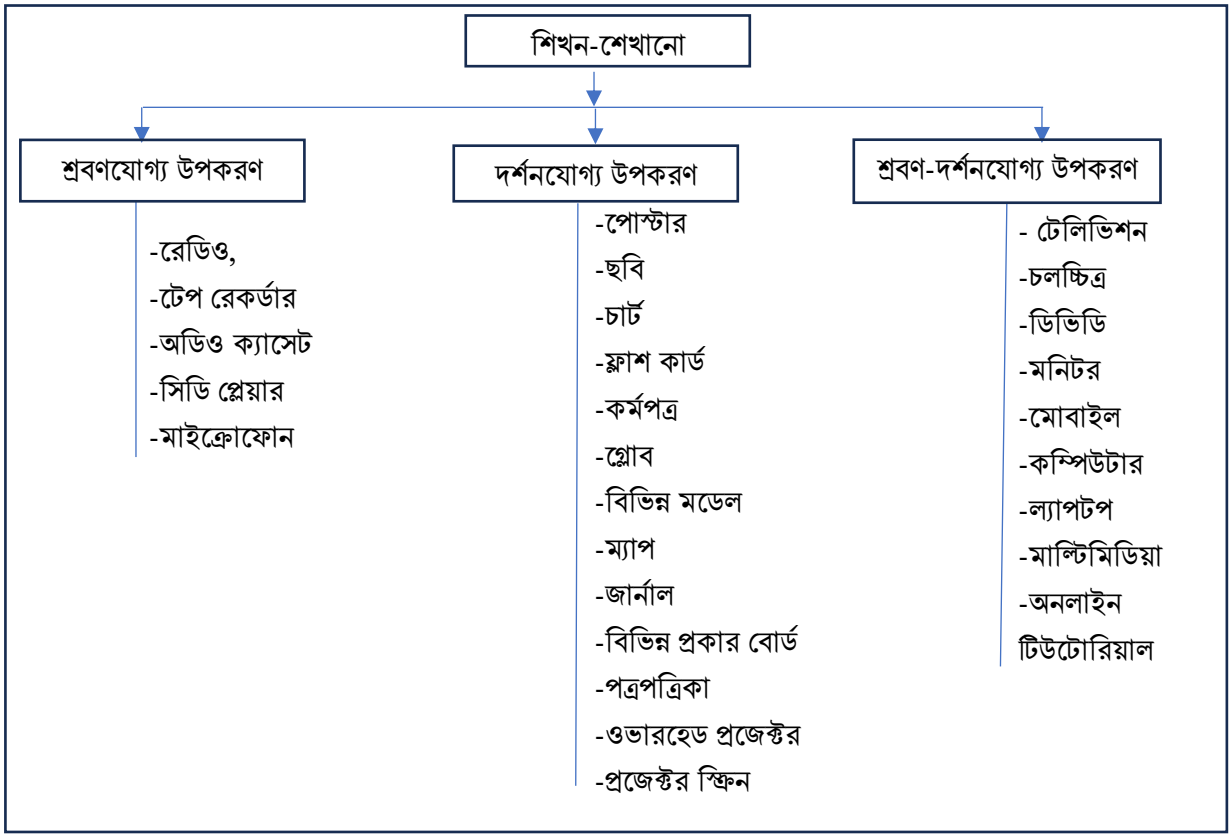

এছাড়াও ব্যবহারের দিক থেকে **কর্ম সম্পাদনমূলক উপকরণ** এবং **অনুসন্ধানমূলক উপকরণও** রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানে কার্যক্রমকে বাস্তবভিত্তিক করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে এমন কিছু উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া যায় যেখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিখে সেগুলোকে কর্ম সম্পাদনমূলক উপকরণ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন: খামার, দর্শনীয় স্থান, মিউজিয়াম, পরিবেশ-প্রকৃতি ইত্যাদি। আবার বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের পাঠদানে ব্যবহৃত এমন কতিপয় উপকরণ যেগুলো ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেগুলোই হচ্ছে অনুসন্ধানমূলক উপকরণ। যেমন: পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য-সামগ্রী, পরিমাপক যন্ত্রাদি, বিভিন্ন পরীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।

আবার, বর্তমানে শিখন শেখানো উপকরণকে মূল্যমান এবং সরবরাহ সুবিধা বা প্রাপ্যতা বিবেচনায় শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ উপকরণের মূল্যমান এবং সরবরাহ সুবিধা বা প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন

১. উচ্চমূল্যের/ দুর্লভ (Scarce) উপকরণ;
২. স্বল্পমূল্যের (Low Cost) উপকরণ;
৩. বিনামূল্যের (No Cost) উপকরণ;

১. উচ্চমূল্যের/ দুর্লভ (Scarce) উপকরণ: শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে যে সকল উচ্চমূল্যের, অপ্রতুল এবং সহজ সরবরাহ যোগ্য নয়, এমন সব শিখন শেখানো উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাদেরকেই দুর্লভ উপকরণ বলা হয়। অর্থাৎ বিষয়গত শিখন শেখানো ব্যবহৃত অপ্রতুল ও সহজ সংগ্রহ যোগ্য নয় এরূপ উপকরণকে দুর্লভ উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যেমন- প্রাচীন নিদর্শন সামগ্রী, প্রাচীন সমরাস্ত্রাবলি, কম্পিউটার, স্কেনিং মেশিন, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারেক্টিভ বোর্ড ইত্যাদি।

২. **স্বল্পমূল্যের (Low Cost) উপকরণ:** শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে যে সকল কম মূল্যের এবং সহজ সরবরাহ যোগ্য শিখন শেখানো উপকরণের ব্যবহার করা হয় তাদেরকেই স্বল্পমূল্যের শিখন শেখানো উপকরণ বলা হয়। স্বল্পমূল্যের উপকরণ আবার দুই ধরনের হতে পারে। যেমন- (ক) হাতে তৈরি উপকরণ। (খ) ক্রয়কৃত উপকরণ । উদাহরণ- ছবি, মানচিত্র, মডেল, চার্ট, পোস্টার, খেলনা সামগ্রী, পুতুল, বিভিন্ন দৃশ্যাবলি, ইত্যাদি স্বল্প মূল্যের শিখন শেখানো উপকরণ।

৩. **বিনামূল্যের (No Cost) উপকরণ:** শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণের ব্যবহার করা হয় তার মধ্য কিছু উপকরণ রয়েছে কোনো অর্থ খরচ না করেই পাওয়া যায় বা সংগ্রহ করা যায় সে সকল উপকরণকেই বিনামূল্যের শিখন শেখানো উপকরণ বলা হয়। যেমন-পুরনো ক্যালেন্ডারের ছবি, দৃশ্যাবলি, পরিত্যক্ত কাপড় এবং ব্যবহৃত কাগজের তৈরি মডেল, চার্ট, পোস্টার, পরিত্যাক্ত প্লাসটিক বোতলের তৈরি খেলনা সামগ্রী, ফুলদানী, ডিমের খোসার তৈরি মডেল, সংগৃহীত গাছপালা, মাটি, পাখির পালক, গাছের শিকড়, বাকল, দড়ি, তুষ, খড়, নারিকেলের মালা, ছোবড়া, পাটের আঁশ, শামুক ইত্যাদি বিনামূল্যের শিখন শেখানো উপকরণ।

শিখন শেখানো উপকরণ তৈরি

শ্রেণিকার্যক্রমে বৈচিত্র এনে শিখনকে আনন্দদায়ক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে শিখন শেখানো উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে উপকরণ সর্বদা দামী এবং বিখ্যাত স্থান থেকে সংগৃহীত হতে হবে এমনটি নয়; বরং বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম স্বল্প মূল্যের (low cost) বা বিনামূল্যের (no cost) শিক্ষক সৃষ্ট কিংবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করাই উত্তম। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের আন্তরিকতা। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়তায় স্বল্প মূল্য বা বিনামূল্যের কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজ হাতে আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতি, মডেল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে উপকরণ তৈরির অধিকাংশ উপাদান আমাদের আশেপাশের পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করা যায়। বিদ্যালয় ও আশেপাশের পরিবেশের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত জিনিসগুলোকে এ ধরনের উপকরণ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক স্তরে স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে, সহজলভ্য ও হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল দিয়েই ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যায়। যেমন-

- মাটি বা কাগজের মণ্ড দিয়ে বিভিন্ন প্রাণী, পর্বত, ফলমূল ইত্যাদির মডেল তৈরি করা যায়।
- কাঠ, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দিয়ে অ্যাবাকাস, পরিমাপের মডেল, যেমন- রুলার কম্পাস ও জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করা যায়।
- আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার কিংবা পুরনো ক্যালেন্ডারের উল্টো পিঠে পেন্সিল, কালি ও রঙের উপযুক্ত ব্যবহার করে চার্ট, নকশা, ছবি, ছক, কার্টুন, ধারণা চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন করা যায়।
- পানির বোতল বা বোতলের অব্যহৃত মুখটি গণিতে গণনার কাজে, কর্কের ভেতর বা বাইরে সাইন পেন দিয়ে সংখ্যা প্রতীক, ইংরেজি বা বাংলা বর্ণমালা লিখে শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- মসুর ডাল, ধান, গম, সুতা, নারিকেলের শলা আর্ট পেপারে গাম দিয়ে লাগিয়ে মানচিত্র, সংখ্যা প্রতীক, বর্ণমালা লিখে আকর্ষণীয় উপকরণ তৈরি করা যায়।
- পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি পাঠ্যপুস্তক থেকে আলোতে ফেলে আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার কিংবা পুরনো ক্যালেন্ডারের উল্টো পিঠে সহজে অঙ্কন করে ব্যবহার করা যায়।
- গাছের শিকড়, বাকল, দড়ি, তুষ, খড়, নারিকেলের মালা, ছোবড়া, পাট, আঁশ, পুরনো কাপড়, শামুক, ফোম, খালি বাক্স ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের শিখন শেখানো উপকরণ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
- পত্রিকার ছবি কেটে আর্ট পেপার বা পোস্টার কাগজে সাজিয়ে চার্ট তৈরি করা যায়।

এছাড়াও বর্তমানে পাওয়ার পয়েন্টে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সহজেই উপস্থাপন করতে পারেন। বিশেষ কিছু সফটওয়্যার, যেমন: পওয়ারপয়েন্ট, ফটোশপ, ফ্লাশ, মুভি মেকার ইত্যাদি শিখে নিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমতো ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করতে পারেন। ইন্টারনেটে অসংখ্য উৎস থেকে ছবি, ভিডিও এবং বিষয়ভিত্তিক ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, যেমন: ভিডিও-র জন্য YouTube (www.youtube.com), ছবির জন্য Google Image (www.google.com) ইত্যাদি। শিক্ষক বাতায়ন থেকেও শিক্ষকগণ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন।

উপকরণ সংগ্রহ

শিখন শেখানো উপকরণ শুধু তৈরি নয়, প্রয়োজনীয় উপকরণ নানা উপায়ে সংগ্রহও করা যায়। যেমন শিক্ষক নিজে কিংবা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন- বিভিন্ন মানচিত্র, পোস্টার, ছবি, পুরাতন মুদ্রা, ডাকটিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। পুরাতন ক্যালেন্ডার, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাদ্যশস্য ও ফলমূল, ধান, চাল, গম, ডাল, বরই, তেঁতুল ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়। পুরাতন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাল্ব, রেডিও, ইস্ত্রি, ব্যাটারি ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। এসব উপকরণ সংগ্রহে স্থানীয় অভিভাবক বা কমিউনিটিকে সংযুক্ত করা যায়। বিষয়ভিত্তিক ছবি ও চার্ট, গল্পের বই, রেডিও, ক্যাসেট, টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদি সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, দানশীল ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) সদস্যদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা যায়। মা সমাবেশ ও অভিভাবক দিবসে মা ও অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের নিকট থেকেও নানা ধরনের শিক্ষাউপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

শিখন শেখানো উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহের বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানো উপকরণ তৈরি করতে পারেন আবার ক্ষেত্র বিশেষে সংগ্রহও করতে পারেন। শিক্ষক স্ব-উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- তালিকায় বর্ণিত উপকরণ বা এর উপাদান আশেপাশের পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় কিনা অর্থাৎ সহজলভ্য কিনা তা বিবেচনা করা।
- স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে উপকরণ সংগ্রহ করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।
- যথাসম্ভব পরিচিত পরিবেশভিত্তিক বিবেচনা করা।
- সংগৃহীত উপকরণটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় কিনা বিবেচনা করা।
- শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, সামর্থ্য ও রুচির প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করার পরিকল্পনা করা।
- সম্ভাব্য উপকরণটি শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সহায়ক কি না তা বিবেচনা করা।
- প্রয়োজনে একই উপকরণ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার করা যায় কি না তা খেয়াল রাখা।
- শিক্ষা উপকরণের কাঠামো শ্রেণি উপযোগী কি না তা বিবেচনা করা।
- উপকণের তৈরির উপাদান স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় এবং সাশ্রয়ী হয় তা বিবেচনা করা।
- সহজে সংরক্ষণ উপযোগী কি না বিবেচনা করা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কি না বিবেচনা করা।
- সহজে ব্যবহার উপযোগী বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে একজন শিক্ষক প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে, সহজলভ্য ও হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল ব্যবহারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজ: বিষয়বস্তুর আলোকে শিখন শেখানো উপকরণের নাম লিখে এসব উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন পূর্বক তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন:

ক্রমিক নং	বিষয় ও বিষয়বস্তু	উপকরণের নাম	তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান	তৈরির প্রক্রিয়া

কাজ: প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শ্রেণি উপযোগী শিখন শেখানো উপকরণ তৈরি করুন-

চিত্র: শিক্ষকদের তৈরিকৃত কিছু উপকরণ

শিখন- শেখানো উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজকে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য শিখন শেখানো উপকরণ ব্যবহার করা হয়। পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন যেমন রয়েছে, উপকরণগুলো নির্বাচন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতারও প্রয়োজন আছে । সার্থক ও ফলপ্রসূভাবে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে সঠিক উপকরণ নির্বাচন ও সঠিক নিয়মে তা ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বপরিকল্পনা করতে হবে। তাই উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

উপকরণ নির্বাচন

- শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে বিষয় সংশ্লিষ্ট উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।
- উপকরণ নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে উপকরণটি আকর্ষণীয় ও সঠিক কি না।
- এমন উপকরণ নির্বাচন করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে এবং চিন্তার উদ্রেক করে।
- উপকরণ নির্বাচনে সহজলভ্য, স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যের কি না তা বিবেচনা করতে হবে।
- সহজে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে তা বিবেচনায় রেখে ইনক্লুসিভ শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

উপকরণ ব্যবহার

- উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষককে উপকরণের ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ উপকরণটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষে কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।
- চার্ট, মানচিত্র, ছবি, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করার সময় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা যেন সহজে সেগুলো দেখতে পায় সেভাবে ঝুলানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- যেসব উপকরণ শ্রেণিতে ব্যবহার করবেন সেগুলো যেন সঠিকভাবে ব্যবহার বা প্রদর্শন করতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- সকল শিক্ষার্থী যেন স্পষ্টভাবে উপকরণ দেখতে পায় ও ব্যবহারে উপকৃত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- উপকরণ শুধু দেখালেই হবে না, প্রয়োজনে নাড়াচাড়া ও স্পর্শ করার সুযোগ দিতে হবে।
- শ্রেণিতে উপকরণ শিক্ষার্থীদের সামনে খুলে রাখা ঠিক নয়। সঠিক সময়ে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং উপকরণ ব্যবহার শেষে তা সরিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ উপকরণ ব্যবহার শেষ হলে তা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টির বাইরে রাখতে হবে।
- যে উদ্দেশ্যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের সময় কোন উপকরণটি সবচেয়ে কার্যকর তা দেখতে হবে।
- পরবর্তীতে কোনো উপকরণ ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই উপকরণ প্রদর্শন না করে, শ্রেণি কার্যক্রম চলার সময় যখন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে তখনই তা প্রদর্শন করতে হবে।
- উপকরণটি এমন স্থানে প্রদর্শন করা যেন শ্রেণির সবাই দেখতে পায়। উপকরণ ছোট হলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সামনে গিয়ে দেখাতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে তা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যাতে ব্যবহৃত উপকরণটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর উপযোগী হয়।
- বিষয়বস্তু ও উপকরণ সমন্বয় করে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে।
- উপকরণে ব্যবহৃত ভাষা ও লেখা সহজ এবং স্পষ্ট হতে হবে।
- পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে উপকরণ ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- উপকরণ যথাসম্ভব বাস্তব ও ত্রুটিহীন হতে হবে।
- উপকরণে ব্যবহৃত ছবি বা বিষয়বস্তু দেশীয় সংস্কৃতির হতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া বিদেশি ছবি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

শ্রেণিতে শিখন শেখানো উপকরণ শুধু ব্যবহার করলেই শিখন ফলপ্রসূ হয়না। উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সতর্ক ও কৌশলী হতে হয়। উপকরণ ব্যবহারের রীতি-নীতি জেনে এগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন ও প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েই শিখন শেখানো সার্থক ও সফল করা সম্ভব। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের উপযুক্ত ও যথার্থ ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের ফলপ্রসূ শিখন।

উপকরণ ব্যবহারে কিছু বিশেষ সতর্কতা:

১. প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিকের ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ব্লেড বা ধারালো কিছু ব্যবহার না করা বা প্রয়োজনে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা।

২. কাঁচের বস্তু ব্যবহার না করা বা বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা।

৩. তেঁতুলের বিচি, শিমের বিচি, নুড়িপাথর বা মার্বেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখা বা সতর্ক থাকা। যাতে শিক্ষার্থীরা এসব বস্তু মুখে নিয়ে খেয়ে না ফেলে বা গলায় আঁটকে না যায়।

৪. কোনো বিশেষ রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি খেয়াল রাখা।

৫. আতঙ্কিত বা ভয় পেতে পারে এমন কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা।

শিখন শেখানো উপকরণ সংরক্ষণ

উপকরণ সংগ্রহ এবং তৈরি করা যেমন জরুরি তেমনি সংগৃহীত বা তৈরিকৃত উপকরণ ব্যবহারের পর যথাযথভাবে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আরও বেশি জরুরি। বারবার এসব উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করা সম্ভব নয়। সে জন্য ব্যবহারের পরপরই এসব উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় এবং বেশ কয়েক বছর ব্যবহার করা যায়। শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের কিছু উপায় নিচে তুলে ধরা হলো:

- প্রতিটি উপকরণ অত্যন্ত যত্নের সাথে নির্দিষ্ট কক্ষে সম্ভব হলে একটি পৃথক কক্ষে উপকরণ কর্নার তৈরি করে শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক উপকরণ সাজিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- উপকরণের হিসাব যথাযথভাবে রাখার জন্য বিষয়ভিত্তিক স্টক রেজিস্টার চালু করা যেতে পারে।
- উপকরণ ব্যবহার শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যথাযথ স্থানে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে।
- মানচিত্র, চার্ট, ছবি ইত্যাদি উপকরণ শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী উপকরণ স্ট্যান্ডে গুটিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- টিন বা প্লাস্টিকের কৌটায় শিমের বিচি, তেঁতুলের বিচি, মার্বেল, গুলতি, চাকতি, নুড়িপাথর ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোন কৌটায় কী উপকরণ রাখা আছে তা স্পষ্ট করে লিখে রাখতে হবে।
- ওষুধ বা সাবানের খালি কার্টুনে বাঁশ বা কাঠের তৈরি দশকের বান্ডিল, বিভিন্ন মডেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।
- পোস্টার পেপার বা পুরনো ক্যালেন্ডারে অঙ্কিত চার্ট, ছবি ইত্যাদি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যায়।
- অপেক্ষাকৃত মূল্যবান শিক্ষাউপকরণ, যেমন: ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া, যন্ত্রপাতি, রেডিও, ক্যাসেট, সহায়ক পুস্তক ইত্যাদি আলমারিতে সংরক্ষণ করা ভালো।
- মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বাস্তব নমুনা কাচের বোতলে পানি ও ফরমালিনের দ্রবণে সংরক্ষণ করা যায়।
- বিদ্যালয় গৃহের পাকা দালানে সিলিং বাক্সে বা টিনের ঘরের পাটাতনে উপকরণ রাখা যায়।
- সংরক্ষিত উপকরণগুলো মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করতে হবে।
- উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপকরণ রাখার জায়গা এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন সেখানে পিঁপড়া বা উইপোকার আক্রমন না থাকে।
- ডিজিটাল কন্টেন্টসমূহ (পাওয়ার পয়েন্ট, স্লাইড, ছবি, ভিডিও) যেন হারিয়ে বা মুছে না যায় সেজন্য কম্পিউটারের পাশাপাশি গুগল ড্রাইভে সংরক্ষণ করতে পারেন।
- শিক্ষকদের নিজের তৈরি ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক বাতায়নে আপলোড বা সংরক্ষণ করতে পারেন।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় উপকরণ ব্যবহারের পরে সংরক্ষণেও যত্নবান হতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যক্রমে উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীর শিখনকে করে আনন্দদায়ক, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী। শিখন শেখানো কার্যক্রমে পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শিক্ষার্থীগণ পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হয়। শিক্ষার্থীগণ নিজেরা 'হাতে-কলমে' কাজ করার সুযোগ লাভ করে।

অ্যামেরিকান একজন শিক্ষাবিদ এডগার ডেল তার অভিজ্ঞতার কোণ বা শিখন পিরামিডে দেখিয়েছেন, একজন মানুষ সবচেয়ে কম শেখে শুধু পড়ার মাধ্যমে। এর চেয়ে আরেকটু বেশি শেখে শোনার মাধ্যমে। ছবি দেখার মাধ্যমে বা ভিডিও দেখলে তাদের শিখন আরো বেশি স্থায়ী হয়। সুতরাং শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের বিষয় সংশ্লিষ্ট যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. এহসান, আবুল ও অন্যান্য (২০১৫), ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পেশাগত শিক্ষা- দ্বিতীয় খন্ড, জাতীয় প্রথমিক শিক্ষা একাডেমি।

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৭), বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০০৮), মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, প্রভাতী লাইব্রেরী।

৪. রাখী, শিরিন আল্লা ও অন্যান্য (২০০২), শিখন শেখানো পদ্ধতি (সিইনএড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

৫. সাবিনা, কাওছার ও অন্যান্য (২০১৮), প্রাথমিক শিক্ষা (বিএড প্রোগ্রামের জন্য), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. হোসেন, মনিরা ও অন্যান্য (২০১২), আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ-২ (বিএড প্রোগ্রামের জন্য), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যায় ৫
শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন

একটি শিক্ষাক্রমের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষে এর সফল বাস্তবায়নের ওপর। এই অধ্যায়ে শিক্ষাক্রমের নীতিগত পরিকল্পনাকে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার বাস্তব রূপ দেওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যেখানে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অপরিহার্য কৌশলসমূহ, সফলতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন অংশীজনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এবং এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রধান চ্যালেঞ্জ বা সীমাবদ্ধতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত করবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন: গুরুত্ব ও কৌশল

শিক্ষাক্রমের যাত্রা শুরু হয় একটি লিখিত পরিকল্পনা আকারে। এটা চূড়ান্তভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে যখন তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর জন্য বাস্তবায়িত হয় এবং শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি জটিল, সময়সাপেক্ষ ও স্পর্শকাতর প্রক্রিয়া যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হয়ে থাকে। তবে এই ব্যাপক কর্মকান্ড তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন তা শিক্ষকের নিকট বোধগম্যতা লাভ করবে, শিক্ষক তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট দক্ষ হবেন এবং এটি বাস্তবায়নে শিক্ষকের আন্তরিক অংশগ্রহণ থাকবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হলো উদ্দেশ্যপূর্ণ শিক্ষাক্রমকে (Intended/Official Curriculum) শ্রেণিকক্ষে বাস্তবে রূপ দেয়া যা অর্জিত শিক্ষাক্রম (Attained Curriculum)-এর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে এর সফল বাস্তবায়নের ওপর। বাস্তবায়নে কোনো ত্রুটি থাকলে শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং শিক্ষা সংস্কারের সামগ্রিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। এজন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সময়ই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ উল্লেখসহ তার বিস্তারিত পরিকল্পনা রাখতে হয়।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ:

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা অপরিহার্য:

১. **শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন (Teacher Professional Development):** নতুন শিক্ষাক্রমের দর্শন, শিখন শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের নিবিড়, বিষয়ভিত্তিক ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণ যেন এককালীন না হয়ে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। শিক্ষকদের এই ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা দরকার।

২. উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবহার (Resource Provision): শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী (যেমন: পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, ডিজিটাল কনটেন্ট, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমাণে, সময়মতো এবং দেশের সকল অঞ্চলের বিদ্যালয়ে সমতার ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে অভিযোজনযোগ্য এবং স্বল্পমূল্যের শিখন উপকরণ তৈরির কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা উচিত, যাতে তারা সম্পদের অভাব মেটাতে পারে।

৩. **পরিবীক্ষণ ও মেন্টরিং (Monitoring and Mentoring):** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং এই পরিবীক্ষণকে শাস্তিমূলক না করে গঠনমূলক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো বাস্তবায়নের দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় অন-সাইট সমর্থন (On-site Support) ও মেন্টরিং প্রদান করা। একটি কার্যকর ফিডব্যাক লুপ স্থাপনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৪. **যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি (Communication and Awareness):** শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও সুবিধা সম্পর্কে সকল অংশীজনকে (অভিভাবক, শিক্ষার্থী, প্রশাসন) যথাযথ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অবহিত করা এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষত অভিভাবকবৃন্দকে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা অপরিহার্য।

৫. **নেটওয়ার্কিং ও সহযোগিতা (Networking and Collaboration):** শিক্ষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পেশাগত কমিউনিটি তৈরি করতে হবে, যাতে তারা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে পারে। এই নেটওয়ার্কিং শিক্ষক বিচ্ছিন্নতা দূর করে এবং সম্মিলিদতভাবে নতুন শিক্ষাতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি তৈরি করে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন একক কোনো পক্ষের কাজ নয়; এর জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সমন্বিত উদ্যোগ এবং অংশীজনদের সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই শিক্ষাক্রমের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। নিচের তালিকায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

অংশীজন	ভূমিকা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	শিক্ষাক্রমের নীতি ও কাঠামো প্রণয়ন, বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা ও শিক্ষক সহায়িকা তৈরি ইত্যাদি।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	শিক্ষকদের সময়মতো মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দ করা এবং মাঠ পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বিস্তার ও তদারকি করা।
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি নিরসনে পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)	শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণকে শিক্ষাক্রমের আলোকে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত করা।
ইউপিইটিসি	বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণকে শিক্ষাক্রমের আলোকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে দক্ষ করে প্রস্তুত করা।
শিক্ষক	শিক্ষাক্রমের দর্শন ও পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমকে অভিযোজিত করে গঠনমূলক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা।
শিক্ষার্থী	শিখন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা, সমালোচনা ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব প্রকাশ করা এবং শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অনুযায়ী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টা করা।
অভিভাবক ও কমিউনিটি	বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ইতিবাচক সহযোগিতা করা, সন্তানের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত থাকা এবং নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
গবেষক ও বিশেষজ্ঞ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি নিরসনে পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতাসমূহ

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পথে প্রায়শই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়, যা শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে:

১. **শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি:** প্রশিক্ষণের সময় অপর্যাপ্ত হওয়া বা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা নতুন পদ্ধতি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতে পারেন। এর ফলস্বরূপ, শিক্ষকরা নতুন শিক্ষাক্রমের দর্শন সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে না পেরে পুরাতন জ্ঞান-কেন্দ্রিক পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, যা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

২. **অপর্যাপ্ত সম্পদ ও উপকরণ:** বিশেষত প্রাথমিক স্তরে, হাতে-কলমে শিখন বা যোগ্যতানির্ভর শিখন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে। বিশেষত গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে উপকরণের অভাবের কারণে শিক্ষকগণ অ্যাকটিভিটি-ভিত্তিক শিখন বাদ দিয়ে তাত্ত্বিক বক্তৃতা নির্ভর পদ্ধতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

৩. শ্রেণিকক্ষের আকার ও সময়সূচি: অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকার কারণে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া এবং নতুন শিক্ষাক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শিক্ষকের মনোযোগ গুণগত শিখন নিশ্চিত করার পরিবর্তে দ্রুত সিলেবাস শেষ করার দিকে স্থানান্তরিত হয়, যা শিখন ফলাফলের গুণগত মান হ্রাস করে।

৪. গতানুগতিক মানসিকতা (Traditional Mindset): শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের মধ্যে পুরোনো জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge-based) শিক্ষণ পদ্ধতির প্রতি দীর্ঘদিনের যে বিশ্বাস রয়েছে, তা পরিবর্তন করে নতুন যোগ্যতাভিত্তিক পদ্ধতির দর্শন গ্রহণ করা একটি বড় সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। এই মানসিকতা পরিবর্তনের প্রতি অনীহা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম সংস্কারের বিরুদ্ধে এক প্রকার সামাজিক বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, যা নতুন পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি করে।

৫. মূল্যায়ন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা: যদি শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক হলেও চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি পুরাতন জ্ঞান যাচাইমূলক হয়, তবে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ না করে কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হন। এই ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিখন শেখানো প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, যেখানে যোগ্যতার পরিবর্তে কেবল মুখস্থনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, ধারাবাহিক সহায়তার ব্যবস্থা এবং সকল অংশীজনের মধ্যে ইতিবাচক সমন্বয় সাধন করা অপরিহার্য।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন একটি জটিল এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র নির্দেশনা অনুসরণ করে সফল হয় না। এই অধ্যায়টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা এই বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করবেন যে, কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত সম্পদের জোগান এবং সকল অংশীজনের ইতিবাচক সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। বাস্তবায়নের সময়ে আসা সীমাবদ্ধতাগুলো (যেমন: অপ্রতুল সম্পদ বা গতানুগতিক মানসিকতা) চিহ্নিত করে সেগুলোর সম্মিলিতভাবে সমাধান করাই সফল শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি। এই জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীদের কেবল বাস্তবায়নকারী নয়, বরং সফল শিক্ষাক্রমের অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে সহায়তা করবে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২১), জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি), এনসিটিবি।

২. এহসান, ড. মোঃ আবুল (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী।

৩. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০০৮), মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, প্রভাতী লাইব্রেরি।